বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

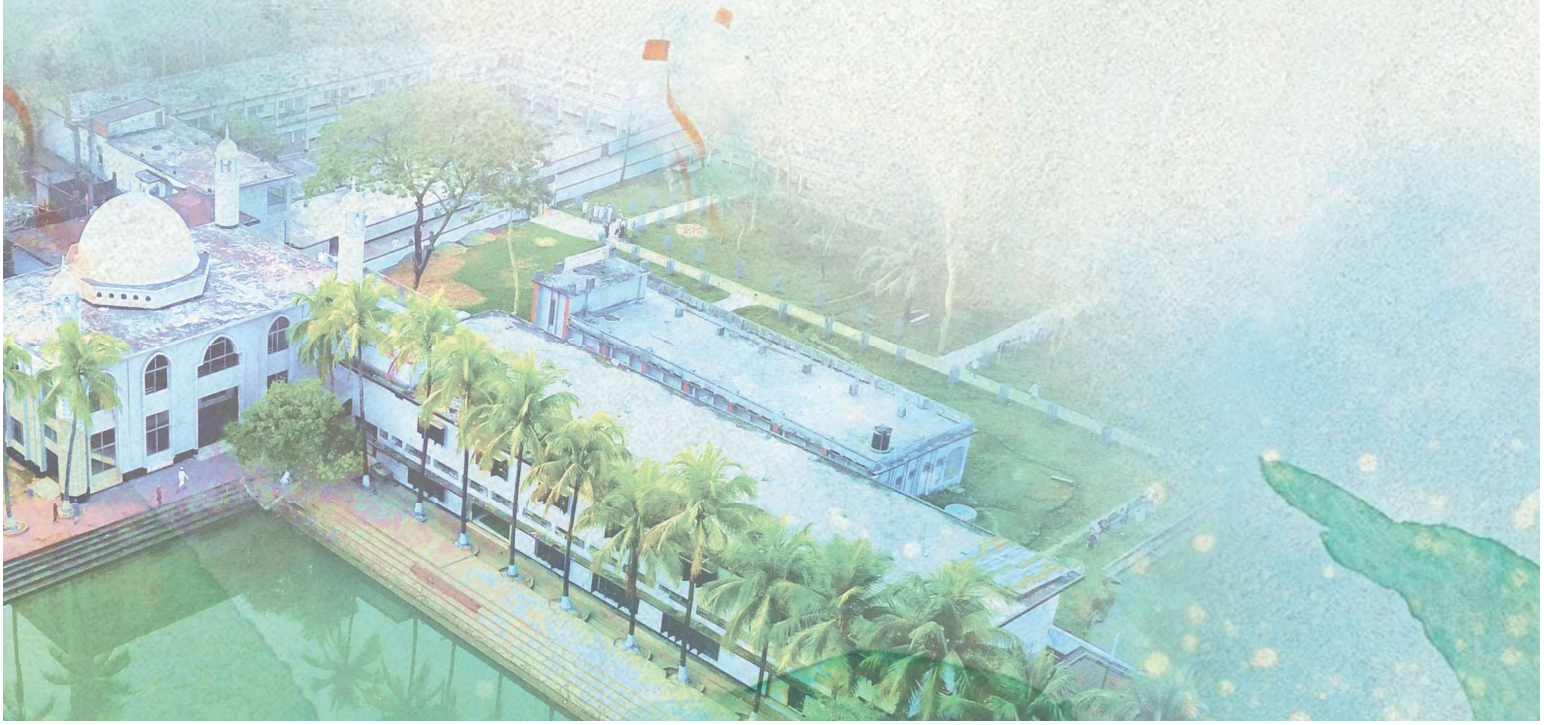
জানুয়ারি ◆ ২০২৫

আখলাকে নববীর অনুপম দৃষ্টান্ত
আল্লামা ফুলতলী (র.)

আত্মপ্রদর্শন নয় বিনয়ই
তাসাওউফের মূলকথা

অসমাপ্ত বিপ্লব : শাম এর ভবিষ্যত

সংবিধান সংস্কার কমিশন
সমীপে কিছু প্রস্তাব



বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

৩২তম বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা

জানুয়ারি ২০২৫ ♦ পৌষ-মাঘ ১৪৩১ ♦ রজব-শাবান ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান
জামান আহমদ

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

প্রবন্ধ
শৈশবের স্মৃতি/আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী ০৫
আখলাকে নববীর অনুপম দৃষ্টান্ত/শাইখুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান (র.) ০৭
আত্মপ্রদর্শন নয় বিনয়ই তাসাওউফের মূলকথা/মুফতী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ১৩
আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) : মুরশিদ ও মুজাহিদ/হামিদ মাশহুর ১৫
হিন্দুত্ববাদ : মুসলিম বিরোধী সহিংসতার তত্ত্ব/মুহাম্মাদ সায়ীদ ১৭

ফিকহ
উযূর মাসাইল/মো. মুহিবুর রহমান ২১

প্যারেন্টিং
শিশুর বেড়ে ওঠার সময় : লালন-পালন ও তারবিয়াত/মূল: হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল গাযালী (র.)
অনুবাদ: ইমাদ উদ্দীন তালুকদার ২৪

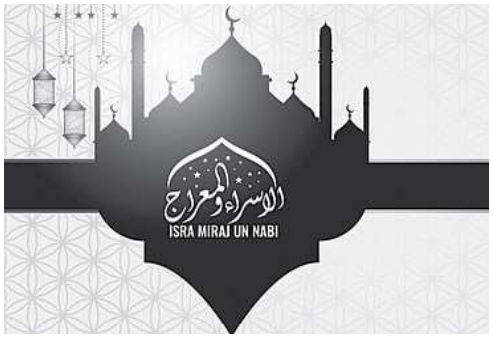
আন্তর্জাতিক
অসমাপ্ত বিপ্লব শেষে শাম দেশের ভবিষ্যত/মুহাম্মাদ বিন নূর ২৬

বিশেষ নিবন্ধ
সংবিধান সংস্কার কমিশন সমীপে কিছু প্রস্তাব ৩২

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩৯
জীবন জিজ্ঞাসা ৪০
খাতুন ৪৩
বিজ্ঞান ৪৫
এক নজরে গতমাস ৪৬
কবিতা ৪৮
আবাবীল ফৌজ ৪৯
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়



نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

২৬ রজব দিবাগত রাত লাইলাতুল মিরাজ। নবুওয়াতের একাদশবর্ষে এ মহিমান্বিত রজনীতে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকে আলার পরম সান্নিধ্য অর্জনের নিমিত্ত ধুলির ধরণী থেকে পাড়ি জমান আরশে আযীমে। সীমাহীন ক্ষমতার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর ঘর থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ ও বাইতুল মুকাদ্দাস হয়ে খোদায়ী বাহন 'বুরাক' এ আরোহন করে উর্ধ্বলোকে গমন করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন আপন রবের অসীম কুদরতের নানা নিদর্শন। এ রজনীতে সাত আসমান পরিভ্রমণ, জান্নাত জাহান্নাম পরিদর্শন, সিদরাতুল মুনতাহা পাড়ি দিয়ে আরশে আযীমে আল্লাহর দীদার লাভ ও কথোপকথনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন তিনি। এ সময় উম্মতে মুহাম্মদীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। নামাযের মাধ্যমে যেহেতু মুমিনেরা আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সুযোগ পায় সেহেতু হাদীস শরীফে নামাযকে 'মুমিনের মিরাজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিরাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক অনন্য মুজিযা। যে সময়ে কোনো আকাশযানের অস্তিত্ব ও ধারণাই ছিল না সে সময়ে এক রাতের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উর্ধ্বলোক ঘুরে আসা সত্যিই বিস্ময়কর ছিল। তাই সে সময়ের কাফির-মুশরিকরা মিরাজের ঘটনাকে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে এর সত্যতা সুদৃঢ়ই হচ্ছে। এ ঘটনার সত্যতা মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত আছে আবহমান কাল থেকে। আর বর্তমান সময়ে এসে তা অস্বীকারের সুযোগ কোনো অমুসলিমেরও নেই।



...

মুরশিদে কামিল, রঈসুল কুররা, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব (র.) আমাদের দেশে এক সুপরিচিত ওলী-আল্লাহর নাম। তিনি আমাদের মাঝে নেই। ২০০৮ সালের ১৫ জানুয়ারি দিবাগত রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। সুদীর্ঘ প্রায় সত্তর বছরকাল যাবত আনজাম দেওয়া দীনের বহুমুখী খিদমতই তাঁর ব্যাপক পরিচিতির অন্যতম কারণ। আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর জীবন আল্লাহর রাহে সর্বোতভাবে নিবেদিত ছিল। তাঁকে একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। এটা কোনো অতিশয়োক্তি নয়; বরং তাঁর জীবন ও কর্ম এবং অবদানই এর বাস্তব প্রমাণ। তিনি ছিলেন তাসাওউফের উচ্চস্তরে আসীন একজন ওলী-আল্লাহ। জৌনপুরী সিলসিলার প্রখ্যাত বুযুর্গ হিসেবে রয়েছে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম। অন্যদিকে ইলমে কিরাতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনন্য ও বিশ্ববিখ্যাত। ইলমে হাদীসের খিদমতে তাঁর রয়েছে পৌনে এক শতাব্দীর প্রোজ্জ্বল ইতিহাস। সমাজের অসহায়-দুস্থ মানুষের সেবায় তাঁর রয়েছে বহুবিধ খিদমত। তিনি সারাটি জীবন মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করেছেন বিভিন্নভাবে। তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী দাঈ-ইলাল্লাহ, পাশাপাশি একজন সুলেখক ও সমাজসংস্কারক। এই মহান মনিষির ইন্তেকালের পর থেকে প্রতি বছর অগণিত ঈসালে সাওয়াবের মাহফিল, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়ে থাকে, ইতোমধ্যে হাজার পৃষ্টার স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়েছে। গত শতাব্দিজুড়ে দেশ-ধর্মের কল্যাণে তাঁর যে ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিলো তার অনেকাংশই এখনো যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। বিশেষত বাংলাদেশের বর্তমান সংকট উত্তরণে আল্লামা ফুলতলী (র.)এর দর্শন ও জীবনসংগ্রাম অত্যান্ত প্রাসঙ্গিক।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ– وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ– إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ–

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষেরা সাধন করে, তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণে বায়ুর দিক পরিবর্তনে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার অনুরূপ তাদেরকে ভালোবাসে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়। যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেমন বুঝবে, হায়! এখন যদি তারা তেমন বুঝতো। সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৬৪-১৬৬)

তাফসীরঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। মুফাসসিরীনের মধ্য হতে একদল বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সাহাবায়ে কিরামের সামনে তিলাওয়াত করলেন, মূর্তি উপাসক মুশরিকরা তা শুনল, তখন মূর্তি উপাসক মুশরিকরা বলতে লাগলো, আমরা এ কথা স্বীকার করি না কারণ, আমরা মনে করি অনেক মাবূদ রয়েছেন। যদি একজনই মাবূদ হয়ে থাকেন, তাহলে তার দলীল কী? তখনই আল্লাহ তাআলা إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এ আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াতটি হচ্ছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলীল।[১]

হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত, উল্লিখিত আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর মদীনায় নাযিল হয়েছিল। মক্কার কুরাইশ কাফিররা বলে, কীভাবে একজন মাবূদ সকল মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবেন? আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ... لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

এ আয়াতের মর্মকথা থেকে তারা অবগত হয় যে, মাবূদ একজনই। তিনি প্রত্যেক জিনিসের মাবূদ এবং প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা।[২]

অন্য একদল বলেন, মুশরিকদের সাওয়ালের জবাব হিসেবে এ আয়াত নাযিল হয়।[৩]

হযরত আতা বিন আবূ রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেছিল, আমাদেরকে একত্ববাদের কোনো নিদর্শন দেখাও। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়।[৪]

হযরত সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা ইয়াহুদীদেরকে বললো, মূসা (আ.)-এর উপর আল্লাহ তাআলার যেসব নিদর্শন অবতীর্ণ হয়েছে, এমন কিছু আমাদেরকে বর্ণনা কর। তখন তাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি ও উজ্জ্বল হাত সম্পর্কে বলা হলো। নাসারাগণকে বললো, ঈসা (আ.) কী কী মুজিযা নিয়ে এসেছিলেন? তখন তাদেরকে বলা হলো হযরত ঈসা (আ.) কুষ্ঠরোগ ভালো করতেন, মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করতেন। তখন মুশরিকরা রাসূল ﷺ-কে বলল, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন। তাহলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ় হবো। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তাদের জন্যে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করবো বটে, কিন্তু এরপরও যদি তারা মিথ্যা

বলে, তবে কিন্তু আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি আমি বিশ্বের আর কাউকে দেইনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে এবং আমার কওমকে ছেড়ে দিন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আয়াত নাযিল করেন।[৫]

অর্থাৎ যদিও তারা চাচ্ছে যে, আমি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তর করে দেই। কিন্তু আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি ও দিবারাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তর করার চেয়েও বড় নিদর্শন রয়েছে। যাতে তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে।[৬]

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা তাঁর একত্ব প্রমাণ করার লক্ষ্যে এসব আয়াত নাযিল করেন।

اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ এর অর্থ হচ্ছে দিনের পর রাতের আগমন। যেমনি جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً। لَيْلَة শব্দটি لَيْل এর বহুবচন এবং نَهَار শব্দের অর্থ আলো। আরবরা এর বহুবচন ব্যবহার করে না।[৭]

وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

الفلك একবচন ও বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ সর্বাবস্থায় একই ধরনের ব্যবহার হয়।[৮]

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

মানুষের মধ্যে সমুদ্রে যে উপকার নিহিত রয়েছে।[৯]

وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

আসমান হতে বারি বর্ষণে অনুর্বর জমি উর্বর হয়ে উঠাতে এবং এর উদ্ভিদ এর উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রমাণ। به এখানে শব্দের ه সর্বনাম ماء শব্দের প্রতি প্রত্যাবর্তিত।[১০]

وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ

আর তিনি যমীনে প্রত্যেক ধরনের জীবজন্তু বিস্তার করেছেন। دَابَّةٍ হচ্ছে প্রত্যেক প্রাণী-যারা যমীনে চলাফেরা করে, যার পাখা আছে আকাশে উড়ে তাদেরকে دَابَّةٍ বলা হয় না।[১১]

وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ

বাতাসের পরিবর্তনের অর্থ বাতাস কখনও রহমত হয়ে আসে, আবার বাতাস কখনও আযাব হয়ে আসে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন- এর অর্থ হচ্ছে انها تاتي مرة جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا অর্থাৎ বাতাস কখনও দক্ষিণ দিক হতে, কখনও উত্তর দিকে হতে, কখনও সামনের দিক হতে এবং কখনও পিছন দিক হতে প্রবাহিত হয়।[১২]

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থাৎ বাদল আসমান এবং যমীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এতে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকের জন্য নিদর্শন।[১৩]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

অর্থাৎ লোকদের মধ্যে কতেক লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানায়। মুমিনরা যেমন আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসেন, তেমনি তারাও মূর্তিকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি ঈমানের আলোতে আলোকিত, সে আল্লাহ তাআলার প্রেমে দৃঢ়। যদি সীমালঙ্গনকারী ব্যক্তিগণ জাহান্নামের শাস্তি দেখত, তবে স্বীকার করে বলত, সর্বত্র আল্লাহরই শক্তি বিরাজমান। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তি দেবেন।

অন্য এক কিরাতে আছে وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ (ى স্থলে ت রয়েছে।) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! কাফিরগণ এবং নিজেদের উপর অত্যাচারী আলিমগণ যখন আল্লাহর শাস্তি দেখবে এবং একথা প্রত্যক্ষ করবে যে, সমস্ত শক্তির আধার হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, তখন তাদের যে অবস্থা হবে তা যদি আপনি দেখতেন (তাহলে বুঝতেন তারা কতই না মন্দ অবস্থায় আছে)। কিন্তু প্রথম কিরাতই সাধারণতঃ পাঠ করা হয়। কুফা, বসরা এবং মক্কাবাসীরা ১ম কিরাতই পড়েন।[১৪]

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ

এখানে إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا বলে আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য করেছেন ঐ সমস্ত লোককে, যারা প্রভাবশালী, শক্তিশালী এবং মুশরিকদের মধ্যে নেতা পর্যায়ের। আবার مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا বলে বুঝাতে চেয়েছেন তাদের দুর্বল অনুসারী ব্যক্তিদেরকে।[১৫]

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন নেতা পর্যায়ের লোকেরা যারা তাদের অনুসরণ করতো তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে।[১৬]

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতে اتَّبَعُوا এর অর্থ হচ্ছে শয়তান, যারা অনুসৃত হয়েছিল। কিয়ামতের দিন সেসব শয়তান তাদের অনুসরণকারী মানুষ হতে পৃথক হয়ে সরে যাবে।[১৭]

হযরত আবূ জাফর (র.) বলেন, এসব বিশ্লেষণের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সাথে শিরককারী মাতব্বরগণ যখন আল্লাহ তাআলার শাস্তি দেখবে, তখন তাদের অনুসারীগণ হতে পৃথক হয়ে যাবে। এখানে শুধু মুশরিকদেরকে বিশেষিত করা হয়নি; বরং ঐসব লোকেরাও শামিল হয়েছে, যারা কুফর এবং গোমরাহীর উপর অনুসৃত হয়েছিল। তাহলে অর্থ হবে, ঐসব লোকেরা আখিরাতে যখনই আল্লাহ তাআলার আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখনই পৃথিবীতে তাদের অন্ধ অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে।[১৮]

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

তারা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে রিওয়ায়াত আছে الْأَسْبَابُ শব্দের অর্থ ঐ সম্পর্ক, যা দুনিয়াতে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।[১৯]

হযরত কাতাদাহ (র.)ও এভাবে বলেন, হযরত মুজাহিদ (র.) অন্য রিওয়ায়াতে বলেন, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে ভালোবাসত তাদেরকেই الْأَسْبَابُ বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[২০]

আর হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, الْأَسْبَابُ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ মর্যাদা, যা তাদের জন্য দুনিয়াতে ছিল। হযরত রবী (রা.) হতে এমনিভাবে বর্ণনা রয়েছে।[২১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে অন্য রিওয়ায়াতে আছে الْأَسْبَابُ শব্দের অর্থ أرحام প্রতিবেশী ও রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন।[২২]

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, أَسْبَابُ শব্দের অর্থ কার্যাবলি বা আমল। আমলের রশিও বলা হয়। আর এখানে ওসীলাকে سبب বা কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ওসীলাই নিজের লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছায়। যেদিন মাতব্বরগণ তাদের অনুসারী হতে পৃথক হবে এবং আল্লাহর আযাব দেখবে সেদিন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিবে।[২৩]

১. তাবারী, ৩/২৬৭-২৬৮; ২. তাবারী, ৩/২৬৮; ৩. প্রাগুক্ত; ৪. তাবারী, ৩/২৬৯; ৫. তাবারী, ৩/২৬৯-২৭০; ৬. তাবারী, ৩/২৭০; ৭. তাবারী, ৩/২৭৩; ৮. প্রাগুক্ত; ৯. তাবারী, ৩/২৭৪; ১০. প্রাগুক্ত; ১১. তাবারী, ৩/২৭৪-২৭৫; ১২. তাবারী, ৩/২৭৫-২৭৬; ১৩. প্রাগুক্ত; ১৪. তাবারী, ৩/২৮১-২৮৩; ১৫. তাবারী, ৩/২৮৭; ১৬. প্রাগুক্ত; ১৭. তাবারী, ৩/২৮৮; ১৮. প্রাগুক্ত; ১৯. তাবারী, ৩/২৮৯; ২০. প্রাগুক্ত; ২১. তাবারী, ৩/২৯০; ২২. তাবারী, ৩/২৯১; ২৩. প্রাগুক্ত;

শৈশবের স্মৃতি

আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

আমি তখন ৭ বছরের শিশু। কিয়ারচন্দন নিবাসী 'নবীন' নামক এক প্রবীণ বৃদ্ধ ছিলেন নৌকার মাঝি। ছাউনি নৌকার ভিতরে আরও ৩ জন শিশু, একজন মহিলা। সুরমা নদীর জল কূল ভেঙে তোলপাড় করে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হচ্ছে। অতিক্রম করছে কালিগঞ্জ-সিলেট রোড।

কালিগঞ্জ-সিলেট রোডে তখন যারা বাসে আরোহন করতেন তারা জানেন যে, যাত্রীবাহী গাড়ি চলার পথে প্রায়ই থেমে যেত। ড্রাইভার একটি শক্ত রশি বাসের মাথায় বেঁধে দিতেন আর যাত্রীরা কিছুক্ষণ প্রাণপণে রশি ধরে টানতেন। হঠাৎ বিকট আওয়াজ করে গাড়ি চলত; যাত্রীরা আবার বাসে আরোহন করতেন। হ্যান্ডুলম্যান নিকটস্থ খাল-বিল থেকে পানি এনে বাসের মাথায় ঢালতেন, হ্যান্ডুল ঘুরাতেন, বাস চলতো।

ইছামতি টাইটেল মাদরাসার পশ্চিমে একটি খাল ছিল। যে খালটি বর্তমান ইছামতি কলেজের পূর্ব পাশের কেয়াবনের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। খাল এখনও আছে কিন্তু মৃতবৎ পড়ে আছে। নদীর কূল ভাঙা জল এ খাল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এখন যেখানে খালটির উপর পাকার পুল নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে আগে বাঁশের তর্জার চাটাই দিয়ে নির্মিত পুল ছিল। বন্যায় পুল ভেঙ্গে গেছে, মধ্যস্থলে কয়েকটি শক্ত বাঁশের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাবা সেই ছাউনি নৌকার পিছনে বসা ছিলেন। সড়কের উত্তর পাশের সঞ্চিত পানি ও দক্ষিণ পাশের পানির মধ্যে ২-৩ হাত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। ভাঙা পুলটির দু'পাশে কী কারণে অনেক লোক সমবেত হয়েছিলেন সঠিক মনে নেই। আমাদের নৌকাটি বাঁশের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে পানিতে ডুবে গেল। মাঝি পানিতে ডুবে বহু চেষ্টা করে কিনারে ওঠে। সড়কে সমবেত লোকদের অনেকে চিৎকার দিয়ে বললেন, ছাব'র নৌকা ডুবে গেল! উদ্ধার করো। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই পানিতে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু নৌকা প্রায় ডুবন্ত অবস্থায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেল। এখনও মনে-মনে চিন্তা করি, যারা সেদিন প্রবল স্রোতের মাঝেও নৌকা উদ্ধারের জন্য সাঁতার দিয়েছিলেন তারা আমার ওয়ালিদ ছাহেবকে অন্তর দিয়ে কতো ভালোবাসতেন। সে মহব্বত ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে খালিস মহব্বত।

নৌকা কখনও ডুবে আবার কখনও কিছুটা ভেসে ওঠে। আমি তখন চিৎকার দিয়ে ডাকলাম 'বাবা'। কয়েকবার দেখলাম আমার বাবা নৌকার পিছনের গলুই কাঁধে নিয়ে সাঁতার কাটছেন। আমার ডাক শুনে তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে কাঁধে নিয়ে তীরে উঠতে পারতেন। বুঝতে পারলাম, তিনি চিন্তা করছিলেন নৌকায় তো আমার শিশুপুত্র ছাড়া আরো ৩টি শিশু রয়েছে। এখন চিন্তা করি আমাদের মত কয়েকজন অসহায় শিশুকে রক্ষা করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আমি আমার কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যে দেখলাম তিনি কত অসহায় মানুষের জীবনতরী উদ্ধার করার জন্য বারবার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবেসেছেন। যে ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষের প্রয়োজন নিবারণ করতেন। তাই আল্লাহ তাআলা অতি সহজে তাঁর নেক ইরাদা পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র হাদীস শরীফে আছে-

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ

নৌকা শেষ পর্যন্ত খালের বাঁকে ঘন কেয়াবনের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে থামলো। নৌকার পানি সিঞ্চন করে আমরা আবার নৌকায় বসলাম। ভেজা কাপড়ে তিনি আমাকে ও অন্য তিনজন শিশুকে কোলে নিয়ে ভীতি দূর করার জন্য ফুঁক দিলেন, জড়িয়ে ধরলেন। তিনি কিছুক্ষণ আল্লাহ তাআলার শোকরগুযারী করলেন।

নৌকা ডুবির ঘটনা শুনে আমাদের গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের বহু লোক আমাদের বাড়িতে জমায়েত হয়েছিলেন। অনেকে বাবার অতি নিকটে এসে 'ছাব' 'ছাব' বলে অনেক্ষণ কাঁদলেন। তিনি প্রতিবেশীকে অকৃত্রিম মহব্বত করতেন; তাই তাদের 'ছাব'কে তারা এতো ভালোবাসতো। নিম্নে উদ্ধৃত পবিত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে নির্দেশ পালনে আমার ওয়ালিদ ছাহেব সর্বদা চেষ্টা করতেন এবং সেই চেষ্টার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। আয়াত শরীফ–

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

-আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকটবর্তীদের সাথে, ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে, প্রতিবেশী নিকটবর্তী ও দূরবর্তীদের সাথে, মুসাফির ও দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা নিসা, আয়াত-৩৬)

নিম্নবর্ণিত পবিত্র হাদীস শরীফসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য ওয়ালিদ মুহতারাম আমাদেরকে বিশেষভাবে তাগিদ করতেন,

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مَن كانَ يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يُؤْذِ جارَهُ– ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ– ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (بخاري: كتاب الأدب)

-হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহমানকে সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। (বুখারী, কিতাবুল আদব)

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ، فَقالَ: كُنْ فِي الدُّنْيا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عابِرُ سَبِيلٍ. وكانَ ابنُ عُمَرَ يقولُ: إذا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرِ الصَّباحَ، وإذا أَصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، ومِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ.

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন, দুনিয়ার জীবনে তুমি এমন হও যেন তুমি অপরিচিত অথবা তুমি যেন একজন পথিক। আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন, আজকের দিনে বিকাল বেলায় আশা পোষণ করো না যে, তুমি আগামীকাল ভোরে জীবিত থাকবে এবং সকাল বেলায় এ আশা পোষণ করো না যে বিকাল বেলা তুমি জীবিত থাকবে। আর অসুস্থতার সময়ের জন্য সুস্থ অবস্থাকে (ইবাদত-বন্দেগীর জন্য) কাজে লাগাও এবং জীবনকে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজে লাগাও। (অর্থাৎ সুস্থ থাকাকালে ইবাদত বন্দেগী বেশি পরিমাণে কর এ ভেবে যে, অসুস্থতায় তা করতে পারবে না এবং জিন্দেগী থাকতে ঐ আমল কর যা মৃত্যুর পর কাজে আসবে।)

নৌকা ডুবি থেকে রক্ষার পর বাবা আমাকে মায়ের কোলে ভেজা কাপড়ে তুলে দিলেন। মা আমাকে কোলে নিয়ে অনেক সাদকাহ খাইরাত মানলেন। মালিক ও মাওলার দরবারে এই বলে ফরিয়াদ করছি; দয়াময় ৭ বছর বয়সেই তো এ অধমের জীবনের অবসান হওয়ার আশঙ্কা ছিল। যতদিন জীবিত রাখো পরপারের কিছু পাথেয় সংগ্রহ করার তাওফীক দান করিও।

মা আমাদের অসুখে-বিসুখে, বিপদে-আপদে মোরগ, বকরী, চাল, নগদ পয়সা মিসকীনকে দান করতেন; বিপদ মুক্তির পর দুরূদ শরীফের ওযীফা 'দালাইলুল খাইরাত' পাঠ করতেন। তারপর বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতেন।

পরবর্তী জীবনে আমার মা দীর্ঘকাল সংসার থেকে আলাদা, প্রায় নির্জনবাসে ছিলেন। মাঝে মধ্যে ইয়াতীমখানার ছোট দু'একজন ইয়াতীমকে বিছানার কাছে ডেকে এনে তাদের মাথায় হাত বুলাতেন। তাদের মায়ের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করতেন। সত্যি তিনি ইয়াতীমদেরে কতটুকু ভালোবাসতেন তা পরিমাপ করা আমার পক্ষে মুশকিল।

সেদিন দেখি তিন-চার জন ইয়াতীম আমার মায়ের কবর পাশে দাঁড়িয়ে দুআ করছে। যিয়ারতের পর লক্ষ্য করলাম তাদের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম: কাঁদছ কেন? তারা কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে উত্তর দিল, দাদি আমাদের ভালোবাসতেন। মায়ের কবর পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, রহমান রহীম, আমার কঠিন হৃদয়কে নরম করে দাও। আমার মায়ের মতো অসহায় ইয়াতীমকে ভালোবাসার তাওফীক দান কর।

عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هٰكَذا وقالَ بإصْبَعَيْهِ السَّبّابَةِ والوُسْطى. (بخاري: كتاب الأدب)

-হযরত সাহ্‌ল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাত মুবারকের তর্জনী ও মধ্যমা (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) আঙ্গুল মিলিতভাবে দেখিয়ে বলেছেন, আমি এবং ইয়াতীমের লালন-পালনকারী বেহেশতে এ রূপে থাকব।

[মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী সম্পাদিত 'আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্মারক' থেকে সংকলিত]

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

Al Arab Tailors

আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট

01734-346601

আখলাকে নববীর অনুপম দৃষ্টান্ত

শাইখুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান (র.)

আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের মধ্যে যাঁদের ওলায়াত বা নৈকট্য দান করেন, তাঁরা মূলত: বহুমুখী গুণাবলি ও বিশেষণে বিশেষিত হয়ে ওঠেন। মকবূল বন্দেগী, উত্তম চরিত্র, মাওলার নিকট নিজেকে নিবেদনের মাধ্যমেই ওলী আল্লাহগণের জীবন সকলের নিকট হয়ে ওঠে গ্রহণীয়। আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ছিলেন সময়ের মহান বুযুর্গ, তরীকতের মুরশিদ, যামানার মুজাদ্দিদ, শাইখুল কুররা, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ওয়াল মুফাসসিরীন, আদর্শ নবীপ্রেমিক ও নায়িবে নবী (সা.)। একই সাথে তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, বাতিলের মুকাবিলায় আপসহীন ব্যক্তিত্ব, মানব দরদী, ইয়াতীম-অনাথের আশ্রয়স্থল এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন সর্ব সাধারণের অনুসরণীয় রাহবার। তাঁর সান্নিধ্য–পরশে সময়ে সময়ে দেশ-বিদেশে অসংখ্য মানুষ তরীকতের উচ্চ মাকাম হাসিলের পাশাপাশি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করে দুনিয়া-আখিরাতের কামিয়াবী অর্জন করেছেন। দেশে বিদেশে তাঁরই দিক নির্দেশনা ও সাহসী ভূমিকায় গড়ে ওঠেছে মসজিদ, মক্তব ও মাদরাসাসমূহ। তিনি ইসলাম-মুসলমান, দেশ-জাতি বিশেষত: ইসলামী আন্দোলন ও দ্বীনি শিক্ষার অভিভাবক হিসেবে আজীবন দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। এখনও তাঁর নির্দেশিত পথে এ সকল খিদমাত পরিচালিত হচ্ছে।

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর মতো মহান ওলীর সান্নিধ্য পাওয়া, শিষ্যত্ব গ্রহণ, তরীকতের ইজাযত হাসিল এ সবই আমার এবং আরো অনেকের জীবনের পরম প্রাপ্তি। তাঁর জীবন-কর্ম এত ব্যাপক ও প্রসারিত যে, তা কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির পক্ষে সীমিত পরিসরে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। তবুও এ মনীষী বুযুর্গ সম্পর্কে সাধারণকে ধারণা দেওয়া সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের কর্তব্য। আর এই কর্তব্যবোধের কারণে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) সম্পর্কে আমার নিজের স্মৃতিচারণ হিসেবে কয়েকটি কথা আলোচনা করার চেষ্টা করলাম।

প্রথম পরিচয়

ছাহেব কিবলাহ'র বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। চার থেকে সাড়ে চার মাইল হবে। তাই বাল্যকাল হতে দূর থেকে তাঁকে দেখেছি। কিছু পরিচয়ও পেয়েছি। তাঁর সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। আমি যেহেতু ছোটবেলা থেকেই কানাইঘাট থানায় লেখাপড়া করেছি, তাই ছাহেব কিবলাহ'র খুব একটা সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়নি। আমাদের এলাকায় কোনোখানে তিনি তাশরীফ নিলে আমরা জড়ো হতাম। পরিচয় পেয়ে আমাকে কাছে ডেকে বলতেন, কাছে ভিড়ে থাকবে। তখন তাঁর এ কথার গুরুত্ব বুঝে উঠতাম না। ধীরে ধীরে লেখাপড়া সামনে অগ্রসর হলো, গাছবাড়ি মাদরাসায় আলিম শ্রেণিতে গিয়ে ভর্তি হলাম। অল্প দিনের মধ্যেই ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ শিক্ষক হিসেবে গাছবাড়ি মাদরাসায় যোগদান করেন। সে সময়ই আমি তাঁর কাছে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাই। আলিম শ্রেণিতে 'নূরুল আনওয়ার' তাঁর কাছেই পড়েছি। তিনি যখন কামিল জামাতে হাদীস পড়াতেন তখন আমি কামিলের ছাত্র ছিলাম না বিধায় ক্লাসে নিয়মিত তাঁর কাছে হাদীস পড়ার সুযোগ হয়নি। সে সময় থেকে ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। সময়ের ব্যবধানে সে ঘনিষ্ঠতা কেবল মজবুত হয়েছে।

ছাহেব কিবলাহ'র উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণ

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ'র বাল্যকালের উস্তাদগণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবো না। অবশ্য তিনি জীবিত থাকতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এটা জেনে রাখা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত এটা করিনি। ছাহেব কিবলাহ বদরপুরে লেখাপড়া করার সময় তাঁর একজন উস্তাদ ছিলেন গণিপুরী ছাহেব (র.)– মরহুম মাগফূর মাওলানা হাবিবুর রহমান ছাহেব। আমরাও তাঁকে পেয়েছি। আমার বড় ভাই (মরহুম মাওলানা নজিবুর রহমান) এবং ছোটভাই (মরহুম মাওলানা খলিলুর রহমান) উভয়ই তাঁর কাছে পড়েছেন। আমি তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাইনি। একেবারে শেষ জীবন পর্যন্ত আমরা দেখেছি ছাহেব কিবলাহ তাঁকে কদমবুসী করতেন। একবার জকিগঞ্জ থানার শহিদাবাদ গ্রামে মাহফিল ছিল। ছাহেব কিবলাহ আগে তাশরীফ এনেছেন। আমরা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করছি। এর মধ্যে কে একজন এসে খবর দিলো গণিপুরী ছাহেব এসেছেন। এমনি ছাহেব কিবলাহ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গণিপুরী হুযূরের কদমবুসী করতে চাইলে তিনি হাত ধরে আটকে দিলেন আর বলতে লাগলেন, দেখো ফুলতলী ছাহেব আমাকে মানুষের বকুনি খাওয়ানোর জন্যে এসব কী করছেন? ছাহেব কিবলাহ বলতে লাগলেন, হুযূর আমাকে ইজাযত দিন, সবার মুরব্বী হয়ে গেছি। গর্দান ঝোঁকানোর জায়গা নেই। এক দুই জায়গায় গর্দান না ঝোঁকালে শয়তান আমার ঘাড়ে সাওয়ার হয়ে যাবে। যা হোক, গণিপুরী ছাহেব হলেন তাঁর উস্তাদ। এ সময় বদরপুরে আর কে কে পড়াতেন তা আমি জানি না। রামপুর তাশরীফ নেওয়ার পর উস্তাদ তো অনেক ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দু'জন। একজন হচ্ছেন খলিলুল্লাহ রামপুরী ছাহেব। তিনি মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি ছাহেব কিবলাহকে হাদীস পড়িয়েছেন এবং দালাইলুল খাইরাত পড়িয়ে ইজাযত দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া ইজাযতনামা ছাহেব কিবলাহ'র ঘরে আছে, আমরা তা দেখেছি। অন্যজন হচ্ছেন- প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ছাহেবে তরীকত মাওলানা ওজীহ উদ্দীন খান রামপুরী ছাহেব। করিমগঞ্জ ও কাছাড় এলাকায় তাঁর অনেক মুরীদ ও খুলাফা আছেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ছাহেব কিবলাহ'র সম্পর্ক তাঁর সাথে অটুট ছিল। চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। একবার ছাহেব কিবলাহ তাঁকে ফুলতলীতে আনতে চেয়েছিলেন। কথা ছিল বদরপুর এসে তিনি ফুলতলীতে আসবেন। কিন্তু বদরপুর এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন নাকি অন্য কোনো অসুবিধার কারণে আর ফুলতলীতে আসা হয়নি। রামপুরী এই

মুহাদ্দিস ছাহেব প্রায়ই ছাহেব কিবলাহকে চিঠি লিখতেন। আমাদেরকে তাঁর এসব চিঠি দেখাতেন এবং পড়াতেন। তিনি এসব চিঠির জবাব লিখে আমাদের দিয়ে পোস্ট করাতেন।

ইলমে কিরাতে ছাহেব কিবলাহ'র উস্তাদগণ

ছাহেব কিবলাহ তো কারী ছিলেন, (বদরপুরী ছাহেবের কাছে পড়েছেন)। তাঁর কাছ থেকে শুনেছি, বদরপুরী ছাহেব নাকি তাঁকে বলতেন, 'অনেক লোক আপনার পেছনে ইকতিদা করবে, এছাড়া নামায ভালো হওয়া নির্ভর করে কিরাত ভালো হওয়ার উপর। তাই আপনি কয়েকদিন 'ভোগার ছাহেব'র কাছে পড়ুন।' 'ভোগার ছাহেব' হচ্ছেন- হাফিয মাওলানা আবদুর রউফ চৌধুরী করমপুরী। তাঁর বাড়ি বড়লেখা থানায়। তিনি মক্কা শরীফে অধ্যয়ন করে এসেছেন। ছাহেব কিবলাহ করমপুরী ছাহেবকে চিঠি দিলেন, আমি অমুক তারিখে আসছি। তারিখমতো করমপুরী ছাহেব তাঁর সকল ছাত্র নিয়ে রেলস্টেশনে এসেছেন অভ্যর্থনা জানাতে। ছাহেব কিবলাহ বলেছেন, আমার খুবই লজ্জা লাগলো যে, আমি এসেছি পড়তে আর তিনি ছাত্রবৃন্দ নিয়ে এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। যা হোক, ছাহেব কিবলাহ করমপুরী ছাহেবের কাছে পাঠগ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে মক্কা শরীফেও পড়েছেন। মক্কা শরীফে তাঁর উস্তাদ হচ্ছেন শাইখ আহমাদ হিজাযী ছাহেব। তিনি ছিলেন শাইখুল ফিকহ ও শাইখুল কিরাত। সে যুগে মক্কা শরীফে কিরাতের ইমতিহান লওয়া, বিশেষ করে ইমাম হতে চাইলে ইন্টারভিউতে আহমাদ হিজাযী যার কিরাতের স্বীকৃতি দিতেন তিনিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন। ছাহেব কিবলাহ বলেছেন, তিনি পড়তে চাইলে প্রথমে তাঁকে সুযোগ দিতে চাইলেন না। বললেন, হিন্দিগণের (হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশবাসীকে তখন হিন্দি বলা হতো) পড়া সহীহ হয় না, শেষে আমার বদনাম হবে। শেষ পর্যন্ত ছাহেব কিবলাহ দু-তিন আয়াত তিলাওয়াত শুনানোর আরয করলে তিনি রাযি হলেন। তিলাওয়াত শুনে নিয়মিত পড়বার খুসূসী ইজাযত দিলেন। দু'বারের হজ্জের সফরে ছাহেব কিবলাহ তাঁকে পুরো কুরআন শরীফ শুনিয়েছেন। তখন হজ্জের সফরে অনেক দিন মক্কা শরীফে থাকার সুযোগ ছিল। শাইখ আহমাদ হিজাযী তাঁকে ইলমে কিরাতের ইজাযত তো দিয়েছেনই, সাথে সাথে বলে দিয়েছেন, আমি ইলমে কিরাতের আমানত আপনার কাছে রাখলাম। যতদিন দুনিয়ায় থাকবেন কুরআন শরীফের খিদমাত করবেন।

বাইআত গ্রহণ

আমি কোনোদিনও ইলমে তাসাওউফের বা তরীকতের মুনকির ছিলাম না। তবে এসবকে নিষ্প্রয়োজন মনে করতাম। ছাত্র জীবনে ধারণা করতাম, কুরআন-হাদীস পড়লাম; আমল-আখলাক শুধরানোর জন্য আর কারো কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। তবে এসবের প্রতি কোনো অবহেলা ছিল না। প্রয়োজন মনে করতাম না– এটুকুই। আল্লাহর শুকরিয়া– এ সময় একটি স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নের তাবীর যে উস্তাদ করলেন তিনি খ্যাতিমান মুতাবির (তাবীরকারী) ছিলেন। স্বপ্নের বিবরণ শুনেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন– সত্যি কথা বলবে, তুমি কি আমাদের পীর-মুরিদী তথা তরীকতের বিষয়াদিকে প্রয়োজনীয় মনে করো না? উত্তরে আমি তা স্বীকার করলাম। বললেন, তোমার স্বপ্নে মনে হচ্ছে– তুমি কোনো একজন আল্লাহওয়ালার লেখা তাসাওউফ বিষয়ক কোনো কিতাব পড়লে মনের অবস্থা পরিবর্তন হবে। তুমিও তরীকতভুক্ত হয়ে যাবে।

ছাহেব কিবলাহ'র বিশেষ শাগরিদ, মুরীদ এবং খলীফা, আমরা তাঁকে খাদিমানী ছাহেব ডাকতাম, ছাহেব কিবলাহ'র নামেই তাঁর নাম- মাওলানা কারী আবদুল লতিফ খাদিমানী ছাহেব। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর সাথে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। আমি যখন কামিল প্রথম বর্ষে পড়ি সে সময় খাদিমানী ছাহেবের সাথে ছাহেব কিবলাহ'র খিদমতে গেলাম। তখন তিনি রামাদান মাসের শেষ দিকে সিলেট শহরে ই'তিকাফ করতেন এবং কুরআন শরীফ তালীম দিতেন। আমি যে বছর গেলাম সে বছর তিনি শেখঘাট মসজিদে ইতিফাক করেন। তাঁর সাথে বারগাত্তী ছাহেব এবং আউশকান্দির ছাহেব (বদরপুরী ছাহেবের দুই খলীফা হযরত মাওলানা শাতির আলী ছাহেব এবং মাওলানা আবদুল ওয়াহাব ছাহেব) ছিলেন। মঞ্জলালী ছাহেবসহ (হযরত মাওলানা আবদুল মুকীত ছাহেব) আরও অনেকে তখন ছাহেব কিবলাহ'র কাছে কুরআন শরীফ পড়েন। আমিও কিছু কিছু পড়ি। সে সময়ই আমি ছাহেব কিবলাহ'র কাছে বাইআত করি। আমি যখন বাইআতের জন্য আরয করলাম তখন আমাকে বললেন, 'তুমি কি এ সম্পর্কে কোনো ইস্তিখারা করেছো?' আমি না বাচক জবাব দিলে ইস্তিখারা করার নির্দেশ দিয়ে ইস্তিখারার একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিও শিখিয়ে দিলেন। আমি এবং খাদিমানী এক সাথেই থাকতাম। রাতে ছাহেব কিবলাহ'র শিখিয়ে দেওয়া ইস্তিখারা করলাম, আল্লাহ আমাকে যা দেখানোর দেখালেন। সকালে তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হলে ইস্তিখারা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস না করেই বললেন, তুমি কি উযূ করে এসেছো? আমি হ্যাঁ বললে তখনই বাইআত করালেন।

অধ্যয়ন

আমি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুধু গাছবাড়ি মাদরাসায় ছাহেব কিবলাহ'র কাছে পড়েছি। উসূলে ফিকহের কিতাব নূরুল আনওয়ার তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেছি। এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না কেবল আলিম ক্লাসে নূরুল আনওয়ার তাঁর কাছে পড়েছি নাকি আলিম ও ফাযিল উভয় ক্লাসেই অধ্যয়ন করেছি। এ ছাড়া ক্লাসে বসে পড়ার সুযোগ হয়নি। তবে হাদীস শরীফ তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়েছি। দু'দিন পড়ার পরই তিনি আমাকে ইজাযত দিয়েছেন। হাদীস পড়ার যে নিয়ম পদ্ধতি- কিরাত, সামাআত ও ইজাযাত এ তিনটি অনুসরণ করেছি। বুখারী শরীফ থেকে ছাহেব কিবলাহ পড়েছেন, আমি শুনেছি। আমি পড়েছি, তিনি শুনেছেন, তারপর ইজাযত দিয়েছেন।

উস্তাদ হিসেবে যেমন ছিলেন

আগেকার যুগের উস্তাদগণের গুণাবলি, শিক্ষাদানের তারয-তরীকা ইত্যাদি বিবেচনায় আনলে তিনি তাঁর যুগে একজন শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ছিলেন। সে যুগে মাদরাসায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। ছাহেব কিবলাহ হাদীস শরীফ এবং অন্যান্য কিতাব পড়াতে ক্লাসে উর্দু ভাষায় তাকরীর করতেন। ছাহেব কিবলাহ মূলত সপ্তাহে দু'দিন পড়াতেন এবং বাকি দিনগুলো অন্যান্য ব্যস্ততায় কাটাতেন। অথচ পড়াতে বসলে মনে হতো যেন তিনি প্রতিদিন– চব্বিশ ঘণ্টা পাঠ দানকারী উস্তাদ। একজন উস্তাদের যে সকল গুণ থাকা দরকার– অন্য যেকোনো উস্তাদের তুলনায় তাঁর মাঝে সেসব গুণ বেশিই ছিল। যেমন একজন উস্তাদের একটি গুণ হলো শাফকাত ফিত তালীম অর্থাৎ ছাত্র বুঝছে কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখা। সে গুণটি তাঁর মধ্যে খুবই প্রবল ছিল। এ কারণে কাউকে একটি বিষয় দু-তিন বার করে বুঝিয়ে দিতেন। আল্লাহর শুকুর তাঁর মাঝে এসব গুণাবলি ভরপুর ছিল। ছাত্র হিসেবে আমার যে অভিজ্ঞতা, উস্তাদ সবাই লায়েক, সবাই নিয়মিত যত্নসহকারে পড়াতেন। কিন্তু ছাহেব কিবলাহ যে বিষয় পড়াতেন, তাঁর তাকরীরের পর ঘরে গিয়ে সে বিষয় আর পড়ার প্রয়োজন হতো না। আমার উপলব্ধি মতে, এ রকম ফায়দা অন্য কোনো উস্তাদের দ্বারা হতো না। কোনো কোনো উস্তাদের দ্বারা সেটা কিছুটা হলেও ছাহেব কিবলাহ'র মতো হতো না।

দরস দান

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের পর দেশে কিছু বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময়

পর্যন্ত ছাহেব কিবলাহ বদরপুর মাদরাসায় পড়াতেন। দেশ বিভাগ পরবর্তী সময়ে দেশে এসে তিনি জকিগঞ্জ থানার বারগাত্তা গ্রামে পড়াতে শুরু করেন। এখানে একটি মাদরাসাও গড়ে ওঠে। কিছুদিন পর স্থানীয় কিছু সমস্যায় মাদরাসায় বিশৃঙ্খলা শুরু হলে তিনি বাড়িতে ফিরে এসে ফুলতলী মাদরাসায় (ফুলতলী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে) শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে গাছবাড়ী মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেখানে নেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে যোগাযোগ করলে তিনি সেখানে যোগদান করেন। সেখানে সপ্তাহে দু'দিন করে নিয়মিত পড়াতেন। গাছবাড়ি থেকে চলে যাবার পর সৎপুর দারুল হাদীস মাদরাসায় পড়াতেন। সপ্তাহে দু'দিন সেখানে হাদীস পড়াতেন। অবশ্য মাঝে-মধ্যে ফাযিল ক্লাসে হিদায়াও পড়াতেন।

১৯৫৯ সালে কামিল পাশ করার পর আমি ইছামতি মাদরাসায় যোগদান করি। মাদরাসায় হাদীস পড়ানোর সিদ্ধান্ত হলে ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে তা শুরু করি। এর অনেক পর আমি দেশের বাইরে (দুবাই) চলে গেলাম। যাবার সময় ইছামতি মাদরাসায় সময় দেওয়ার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করি। সদয় সম্মতিপূর্বক এখানেও তিনি সপ্তাহে দুদিন হাদীস পড়াতেন। এরপর ফুলতলী মাদরাসায় কামিল শুরু হলে সেখানে সপ্তাহে দু'দিন নিয়মিত হাদীস পড়াতেন। আজীবন সেটা অব্যাহত রাখেন। এক সময় গঙ্গাজল মাদরাসার (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৫ ইং) পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল। তিনি মাঝে মধ্যে সেখানে যেতেন, তবে পড়াতেন না। সে সময় গঙ্গাজল মাদরাসার দায়িত্বে ছিলেন ছাহেব কিবলাহ'র উস্তাদ গণিপুরী ছাহেব (র.)। এ সময়ে তিনি বারগাত্তায় সপ্তাহে একদিন, পরবর্তীতে সৎপুরে একদিন, এভাবে বিভিন্ন স্থানে একদিন করে কুরআন শরীফ পড়াতেন।

গাছবাড়ি মাদরাসায় ছাহেব কিবলাহ

হযরত ছাহেব কিবলাহ গাছবাড়ি মাদরাসায় মূলত হাদীসই পড়াতেন। পাশাপাশি মুহতামিম (পরে মুহতামিমের বদলে পদটি প্রিন্সিপাল হয়েছে) মাওলানা আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেবকে মাদরাসা পরিচালনায় সহযোগিতা করতেন। আমরা তাঁকে নায়িবে মুহতামিম (ভাইস প্রিন্সিপাল) হিসেবে জানতাম। মুহতামিম ছাহেব হজ্জে গেলে তিনি ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন তো হজ্জের সফর হতো জাহাজে। দু'তিন মাস লেগে যেত। সে সময়টা আমাদের ছাত্রদের খুবই সতর্কতার সাথে চলতে হয়েছে। বাজারের কাছেই মাদরাসা। অনেক ছাত্র বাজারে চলে যেত, সময় মতো ক্লাসে উপস্থিত হতো না। কিন্তু ছাহেব কিবলাহ যে ক'দিন মাদরাসায় থাকতেন, সেটা হতো না। তাঁর উপস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক সবাই সতর্ক থাকতেন।

ছাহেব কিবলাহ'র নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় হাদীসের খিদমাত

কামিল পরীক্ষার পর আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। পরীক্ষার পর অনেকদিন বাড়িতে অবস্থানের পর কিছুটা সুস্থ হয়েছি। একদিন বিকেলে আমার একজন উস্তাদ হযরত মাওলানা শামসুল হুদা ছাহেব এলেন। গাছবাড়িতে তাঁর কাছে হাদীস পড়েছি। বললেন, 'তুমি আমার মাদরাসায় (ইছামতি) চলো।' আমার বাবা তখনো জীবিত আছেন। তাঁর অনুমতি চাইলে তিনি জবাবে বললেন, আমি কী বলবো, আপনারা যে কাজের উপযুক্ত করে গড়েছেন সে কাজে নিয়ে লাগান। আমি মাদরাসায় চলে গেলাম, পড়ানো শুরু হলো। এর মাঝেই সিদ্ধান্ত হলো, হাদীস শরীফ পড়ানো হবে। কারণ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা (মাওলানা মতিউর রাহমান চৌধুরী) নাকি হাদীস পড়ানো দিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে হাদীস শরীফ পড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। আমি তো ইতোপূর্বে হাদীস শরীফ পড়াইনি। এ ছাড়া পড়ার সময় হাদীস পড়াতে হবে এমন কথা মনে আসেনি কখনো। চলে গেলাম ছাহেব কিবলাহ'র কাছে। তিনি বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়াও, হাদীসও পড়াও। আরয করলাম, এখানে ছাত্র আসবে না হাদীস পড়তে। কারণ হাদীস ক্লাসের অনুমোদন নেই। বললেন, যার মুকদ্দরে আছে তোমার কাছ থেকে হাদীস পাবে সে তো আসবে। এ সময় বিলপারী ছাহেব (হাফিয মাওলানা নূরুল হক) গং কে ছাহেব কিবলাহ ইছামতিতে হাদীস পড়াতে পাঠান। ছাহেব কিবলাহ'র ইজাযত অনুসারে পড়াতে শুরু করলাম। প্রথম দিকে নাসাঈ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ ও তাফসীরে বায়দাভী এসব পড়াতাম। ১৯৬৩ সালের ১১ এপ্রিল ফুলবাড়ি মাদরাসায় যোগদান করি। সেখানে হাদীস জামাত নেই, ফাযিল পর্যন্ত পড়ালাম। এর সাত মাস পর ছাহেব কিবলাহ জোর করে বললেন, সৎপুর আলিয়া মাদরাসায় আমিই টাইটেল ক্লাস শুরু করিয়েছি। তুমি সেখানেই যাবে। একদিকে অনেক দূর এবং অপরিচিত জায়গায় যেতে আমার কিছুটা পিছুটান ছিল। এ সময় একদিন বড় বেআদবী করেছি। আমি তখন কিসমত মাইজভাগ লজিংয়ে ছিলাম। রাস্তার কাছে গাড়ি থামিয়ে ছাহেব কিবলাহ এগিয়ে গিয়ে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে না, আমি দেবো। তুমি সেখানে চলে যাও। আর পড়ানোতে তোমার সহযোগী হিসেবে গোটারগ্রামী মুহাদ্দিস ছাহেবকে (মরহুম শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার) দিচ্ছি। তিনি তখন গঙ্গাজল মাদরাসায় কর্মরত। তাঁকে হুকুম করলেন, এই শনিবার থেকেই চলে যাও। আর আমি গেলাম এর এক সপ্তাহ পর। ১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর যুহরের জামাতের কিছু পর মাদরাসায় গিয়ে পৌঁছি। ছাহেব কিবলাহ (সৎপুর যাওয়ার জন্য) খুব জোর দিলেন। অথচ আমি বড় বেআদবী করেছি, যেতে চাইনি। অল্প দিন পর মাদরাসা গরমের ছুটি হলে বাড়িতে এলাম। খাদিমানীকে বললাম, চলুন ছাহেব কিবলাহকে দেখে আসি। গরমের দিন, দুপুরের খাবারের পর বাইরের ঘরে ছাহেব কিবলাহ আরাম করছেন। আমরা খেদমত করছি। এ সময় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে জোর করে সৎপুর দিলাম। আসলে আমি বড় পেরেশানিতে পড়েছিলাম। কারণ সেখানে কামিল ক্লাস আমিই শুরু করিয়েছি। মুহতামিম ছাহেব ভাবুক মানুষ। তিনি কাউকে খোঁজ করবেন না। আমাকেই দিতে হবে মুহাদ্দিস। বড় পেরেশানির মধ্যে পড়ে গেলাম। কাকে দেবো খুঁজে পাচ্ছি না। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। নিজে কামিল শুরু করিয়েছি; অথচ উস্তাদ যদি দিতে না পারি। একদিন খুবই কাতর মনে বসে আছি। হঠাৎ করে আল্লাহপাক চোখের হিজাব সরিয়ে দিলেন। দেখি হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ রেখেছেন। আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বপ্ন দেখে বড় সাধ করে হাদীসের ক্লাস খুলেছি, পড়ানোর জন্য কাকে দেবো খুঁজে পাচ্ছি না। এ সময় আঙুল মুবারক দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। আমি পুরো ফিরব কেমনে, বেয়াদবী হবে। আস্তে করে চোখ ফিরিয়ে দেখি তুমি আমার পেছনে বসা। এ কারণেই তোমাকে এতো জোর করলাম। তাৎক্ষণিক আমি কদম শরীফে ধরে আরয করলাম, আমি তখন বুঝিনি, যেতে দেরি করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। এভাবেই শুরু হলো হাদীস শরীফ পড়ানো।

ছাহেব কিবলাহ'র অনুমতি ও নির্দেশ পালনে আমার প্রবাস জীবন

আমার এক আত্মীয় (মাওলানা জামিল রিদওয়ান, মাথিউরা, বিয়ানীবাজার)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই দুবাই থাকতেন। উনার সাথে আত্মীয়তা হওয়ার পূর্ব থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি চিঠি লিখলেন দুবাই যাওয়ার জন্যে। আমি তখন ছাহেব কিবলাহ'র অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিতে দেরি করলেন। ছাহেব কিবলাহ'র সাধারণ অভ্যাস (আমার ব্যাপারে) জানা ছিল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে চাইলে জবাব দিতে দেরি করতেন। আমিও জবাব পাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করতাম না। কিছুদিন পর আমাদের ইছামতি মাদরাসার এনামী জলসায় ছাহেব কিবলাহ তাশরীফ আনলেন। সেদিন না চাইতেই তিনি বলতে শুরু করলেন, তোমাকে এক বার বিদেশ যেতে দেওয়া দরকার। কারণ হিজরতও হলো একটি জরুরি কাজ। হিজরতের অর্থ কেবল মেরে দেশ থেকে তাড়ানো নয়। আসলে স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে কিছুদিন একা থাকার মাঝে তরীকতের এক রহস্য নিহিত আছে। তুমি ব্যবস্থা করে দুবাই চলে যাও। তারপর ব্যবস্থা হলো, আমি দুবাই চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে চাকরি নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। যে চাকরির আশা ছিল (আদালতে) সেটা হচ্ছে না। অনুসন্ধান করে জানা গেল মূলত আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী বিধায় আমার চাকরি হচ্ছে না। দুবাইয়ে যে এলাকায় আমি থাকতাম সেখানে স্থানীয় কেউ হানাফী মাযহাবের নেই। বেশিরভাগ হাম্বলী আর সামান্য অংশ মালিকী। বহিরাগতরা হানাফী। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া থেকে আগতরা প্রায় হানাফী। অবশ্য ইন্ডিয়ার মালেবার এবং কেরালার লোকজন শাফিঈ। এ অবস্থায় ছাহেব কিবলাহ'র কাছে চিঠি লিখলাম। তখন তো ফোনের যোগাযোগ বর্তমানের মতো ছিল না। লিখলাম আমি হানাফী, কেবল এই কারণেই আমার চাকরি হচ্ছে না। ছাহেব কিবলাহ চিঠির জবাব দিলেন (চিঠিখানা এখনো আছে, আমার ঘরে খোঁজ নিলে পাওয়া যাবে) যে, 'তুমি প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দাও। উত্তীর্ণ হবে। এ কারণে চাকরি না হবার কথা নয় ইনশাআল্লাহ। হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আল্লাহপাক কী এনায়াত করেছেন তুমি দেখতে পাবে। পরবর্তী ইন্টারভিউ দেওয়ার দু'রাত আগে স্বপ্ন দেখলাম (প্রয়োজনে বলতে হচ্ছে, নতুবা এসব স্বপ্নের কথা না বলাই ভালো)। দেখলাম- ইমাম আযম হেঁটে যাচ্ছেন, তাঁর পেছনে ছাহেব কিবলাহ। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে অতিক্রম করার সময় ছাহেব কিবলাহ ইমাম আযমকে লক্ষ্য করে আমাকে দেখিয়ে বললেন- এই বাচ্চার কথাই বলেছিলাম আপনাকে। এরপর খুব সহজেই চাকরি হয়ে গেল।

দু'বছর পর ছুটিতে দেশে এলাম। আমার ইচ্ছা আর দুবাইতে ফিরবো না। ইছামতি মাদরাসার জলসা ছিল, ইরাদা ছিল সেখানেই ছাহেব কিবলাহ'র অনুমতি চাইব। কিন্তু তিনি বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ায় জলসায় আসতে পারলেন না। পরদিন বাদ ফজর ফুলতলীতে চলে গেলাম। গিয়ে জানতে পারলাম এখনো তাঁর অবস্থা তেমন ভালো নয়। বেশি কথাবার্তা বলতে ডাক্তার নিষেধ করেছেন। আমি এসেছি শুনে অন্দর মহলে ডেকে নিলেন। আমি জিজ্ঞেস করার পূর্বেই বললেন, তোমার কিছু দুর্বলতার কারণে আমার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ হয়নি। তুমি আরো কিছুদিনের জন্য দুবাই চলে যাও। তোমাকে আমি যখন বলবো তখন ফিরে আসবে। আর যারা (তখনকার ছাত্র) আমার কাছে হাদীস শরীফ পড়তে আগ্রহী ছিল, যেমন- জকিগঞ্জ মাদরাসার বর্তমান প্রিন্সিপাল মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রমুখ তাঁদেরকে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে বললেন, উনাকে আবার বিদেশে না পাঠালে হচ্ছে না। দৌলতের জন্যে নয়। দৌলত দেশেও আছে, বিদেশেও আছে। আসলে আমার একটা গরজের জন্যে তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। এখনো কিছু কাজ বাকি আছে। তাই আবার যাওয়া দরকার। তোমরা মনে নারাজি আনবে না। পড়া চালিয়ে যাও, তিনি দেশে ফিরে এলে তাঁর কাছে হাদীস পড়বে।

এখানে কিছু কথা বলা দরকার। মূলত আমি দুবাই গিয়েছিলাম ভ্রমণ ভিসায়। চাকরি করবো বা সেখানে থাকবো সে রকম পরিকল্পনা প্রথমে ছিল না। ইচ্ছা ছিল সেখান থেকে হজ্জে যাব, তারপর দেশে ফিরে আসবো। কিন্তু সেখান থেকে হজ্জে যেতে আইনি জটিলতা দেখা দিলো। এক বছর সেখানে কাজ নিয়ে না থাকলে হজ্জের ভিসা পাওয়া যায় না। ছাহেব কিবলাহ'র সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বললেন, তুমি কিছু একটা কাজ নিয়ে সেখানেই থাকো। আগামী বছর আমিও হজ্জে আসবো। আমার সাথে হজ্জ করবে। ছাহেব কিবলাহ'র এই পরামর্শ মতোই দুবাইয়ে অবস্থান করার পরিকল্পনা। যা হোক, প্রথমে একটি মসজিদে ইমাম হিসেবে যোগ দেই। পরবর্তীতে আগে যে চাকরির কথা বলেছি, অর্থাৎ কোর্টে যোগদান করি। কোর্টের কাযী সাহেবের সাথে আসলে পূর্ব থেকেই সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। কোর্টে যোগদানের ব্যাপারে তিনিই আমাকে উৎসাহিত করেন এবং বিশেষ সহযোগিতা করেন। কাযী সাহেবের মুসাঈদ বা সহযোগী হিসেবে কোর্টে যোগদান করি। মাঝে মাঝে মুতারজিমের কাজও করতে হতো। এ ছাড়া কিছুদিনের মধ্যে কোর্টের কুতুবখানা আমার দায়িত্বে দেওয়া হয়। আসলে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বাঙালি, পাকিস্তানী এবং ইয়ামানী লোকদের মামলার রায় প্রদানে হাম্বলী কাযী সাহেবকে সহযোগিতা করতে হতো। তখন ব্যাপকভাবে কিতাব ঘেটে হানাফিয়্যাত রক্ষা করে রায় তৈরি করতে হতো। এ ছাড়া প্রথমে যে মসজিদে ইমামতীতে ছিলাম, সেখানকার মুসল্লিয়ান ছাড়তে চাইল না। তাই খতীব হিসেবে সেখানেও দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।

দুবাই থাকাকালীন ছাহেব কিবলাহ'র সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমেই যোগাযোগ হতো। প্রয়োজনমতো ছাহেব কিবলাহ'র কাছে চিঠি লিখলে তিনি উত্তর দিতেন। একবার এমনিতেই ছাহেব কিবলাহ আমাকে একটি চিঠি দিলেন। তিনি লিখেছিলেন, আমি শুনেছি তুমি যা বেতন পাও প্রায় সবই বণ্টন করে ফেলো। এখন থেকে তা আর করবে না। বাড়িতে টাকার দরকার আছে। কিছু বিত্তের প্রয়োজনও রয়েছে। এখন থেকে এভাবে বণ্টন বন্ধ করবে, না হয় আরেক চিঠিতে লিখবো বেতন পেয়ে পকেট খরচের টাকা রেখে বাকিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। যা হোক, মূলত চিঠি মারফত যোগাযোগ হতো সব সময়।

প্রকৃতপক্ষে দুবাই থাকার সময়টা নির্ভর করে ছাহেব কিবলাহ'র নির্দেশের উপর। কেননা, আমি তো দু'বছর পরই দেশে ফিরে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ছাহেব কিবলাহ আমাকে বলে দিলেন- কখন ফিরে আসবে তা আমি বলে দেবো। জগন্নাথপুর থানার সৈয়দপুরের ঘটনার পর ছাহেব কিবলাহ লন্ডন সফর করেন। তখন আমাকে চিঠি লেখেন। চিঠির সারকথা- আমি বেঁচে থাকতে একবার লন্ডন চলে এসো। আমার সম্পর্কিতদের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো। আগামীতে ইসলামের কাজ করতে সুবিধা হবে। এ চিঠি পেয়ে (দুবাই থেকে) ব্যবস্থা করে লন্ডন আসি। লন্ডন আসার পরের রাতে ছাহেব কিবলাহ আমাকে কাছে বসিয়ে বললেন, তুমি এবার দেশে চলে এসো। আল্লাহ যা দেওয়ার দিয়েছেন। মানুষের মালামত আর সহ্য হচ্ছে না। শিঙ্গাইকুড়ির ছাহেবের সাথে (হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান চৌধুরী ছাহেব) দেখা হলেই বলেন- তোমাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে। এই হুকুমের পর তিন-চার মাসের মধ্যেই আমি দেশে ফিরে আসি।

হযরত ছাহেব কিবলাহ'র নির্দেশে লন্ডন সফর

সৈয়দপুরের মর্মান্তিক ঘটনার কিছুদিন পরই ছাহেব কিবলাহ লন্ডন সফরে আসেন। এ সফরে তিনি দীর্ঘ সময় লন্ডনে অবস্থান করেন। আগেই বলেছি, ছাহেব কিবলাহ'র চিঠি পেয়েই আমি লন্ডন সফর করি। আসলে সেটা ছিল তৃতীয় চিঠি। এর আগে আরো দুটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন, তোমার মন চাইলে লন্ডন বেড়িয়ে যেতে পারো। তখন আমার মন চায়নি, তাই লন্ডন যাইনি। তৃতীয় চিঠিতে গুরুত্ব দিয়ে লিখলেন। বিশেষ করে লিখলেন, লন্ডন এলে তো আমাকেও দেখে যেতে পারবে। সৈয়দপুরের ঘটনার পর তাঁকে দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সব মিলিয়ে তখনই লন্ডন যাই। লন্ডন গিয়ে দেখলাম ছাহেব কিবলাহ ছাহেবানীসহ হজ্জে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে আমাকে লন্ডনে রেখে যাবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু আমি আসার পরের দিনই নাকি ছাহেবানী ছাহেব কিবলাহকে বললেন- উনাকেও সাথে নিন। একবার আরাফায় উনি ছিলেন, খুব ভালো লেগেছিল। ছাহেব কিবলাহ নাকি বলেছিলেন, পয়সার যোগাড় কীভাবে হবে? শুনেছি, ছাহেবানী বলেছেন, আমার সন্তান হিসেবে আমি দেবো পঞ্চাশ পাউন্ড। ঘরের অন্য রুমে বসা হাজী বশির মিয়া সাহেব, হাজী রজব আলী সাহেব এবং যার ঘরে আমরা বসা ছিলাম জয়নাল আবদীন খান সাহেব। সেটা ছিল জনস্কার হাউস। সেদিন ছিল শুক্রবার। ছাহেব কিবলাহ ঐদিন ওয়াকিং শাহজাহান মসজিদে জুমুআ আদায় করেছিলেন। জুমুআর পর ঘরে ফিরে ছাহেব কিবলাহ ও ছাহেবানীর মধ্যে উল্লিখিত আলাপ হয়। যে রুমে আমি বসা ছিলাম, সেখানে ছাহেব কিবলাহ তাশরীফ আনলেন। আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, বিবি চাচ্ছেন মুহাদ্দিস ছাহেবকে সাথে নিতে। তিনি দিয়েছেন পঞ্চাশ পাউন্ড আর আমি দেবো দুই'শ পাউন্ড। একথা শুনেই বশির মিয়া সাহেব বলে উঠলেন, ছাহেব বাকি যা খরচ লাগে আমি দেবো। বশির মিয়া সাহেবের কথা শুনে ছাহেব কিবলাহ বললেন, তুমি তো এ কাজে খুব আগুয়ান। এতো পয়সা কোথায় পাবে? (তখন বশির মিয়া সাহেবের নিজস্ব কোনো ব্যবসা ছিলো না)। যা হোক, পয়সার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেদিন ছিল সাউদী এম্বাসিতে কাগজ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। তাৎক্ষণিক ছবি তোলা হলো। ছাহেব কিবলাহ পরামর্শ দিলেন, তুমি নিজে সাথে যাও, প্রয়োজনে তাদের সাথে কথা বলবে। তাদের ইচ্ছা হলে ভিসা দেবে। জয়নাল আবেদীন খান সাহেব (মরহুম) আমাকে নিয়ে গেলেন। আমার মনে হলো ভিসা পেয়ে যাবো। এর কারণ, যে দিন লন্ডন আসি সেদিনই রাতে ছাহেব কিবলাহ আমাকে বললেন, কাসীদায়ে নুমান তো সাথে আনিনি। রাওদা শরীফের কাছে গিয়ে তা পড়ার ইচ্ছা। তাই ইয়াদ থেকে লিখেছি। তুমিও এটা কপি করে রাখো। তখন পর্যন্ত আমার হজ্জে যাবার ইরাদা নেই, পরিকল্পনাও ছিল না। তিনি আমাকে কিছু খাবার জিনিস দিয়ে বললেন, এদেশে রাত দীর্ঘ, খিদে লাগবে। এটা খেয়ো এবং কাসীদা লিখে রাখো। এ কারণেই আমার মনে হলো যে ভিসা পেয়ে যাব। এম্বাসিতে গিয়ে দেখা গেলো শনি ও রবিবার তো এমনিতেই বন্ধের দিন। কিন্তু ঐদিন শুক্রবার হওয়ায় দিবস বাকি থাকতেই তারা বন্ধ করে দিয়েছে। কাউন্টারে বসা লোকটি বললো- এখন তো অফিসের সময় নেই, ফিনিশ। দেখতে পেলাম অফিসার গোছের আরেকজন অন্যত্র বসা। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন স্থান থেকে কাগজপত্র তাঁর টেবিলেই যাচ্ছে। আমি কাউন্টারে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি উনার সাথে দেখা করতে পারি? লোকটি বললো, অসুবিধা নেই, যান। আমি ঐ অফিসারের কাছে গিয়ে সালাম দিতেই জবাবে বললেন, আইয়্যুল খিদমাহ, কী সাহায্য করতে পারি? উত্তরে বললাম, আমি এ দেশে ভ্রমণে এসেছি। এখানে যারা আমার মেজবান তারা সবাই হজ্জে যাচ্ছেন। তাদের দেখাদেখি আমারও শখ হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী করেন? বললাম, দুবাই কোর্টে চাকরি করি। কাগজ বের করে দেখালাম। বললেন, ফটো সাথে আছে? বললাম, আছে, আজ শেষ দিন জেনেই এসেছি। তিনি বললেন, আমাদের কাগজের বান্ডিল প্রস্তুত, এখনি পাঠিয়ে দেব। আপনি ফরম পূরণ করে ফটো ও ফি জমা দিন। আমি তাই করলাম। কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিন আসবো? ঐ ব্যক্তি বললেন, আর তো দিন নেই। আপনি তিন ঘণ্টা পর এসে ভিসা নিয়ে যাবেন। আমরা তাই করলাম।

ইলমে কিরাতে ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর খিদমত

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ সারাজীবন কুরআন শরীফের খিদমাত করেছেন। তিনি 'দারুল কিরাত' শুরু করার পেছনে যে কারণ বলেছেন- তা হলো, তিনি তখন বদরপুর পড়াতেন। একদিন ক্লাসে এসে বসে পড়েছেন গড়কাপনী ছাহেব (মাওলানা আবদুন নূর ছাহেব)। তিনি বড়ই উঁচু মর্যাদার বুযুর্গ ছিলেন। ক্লাস শেষে বললেন, আমি কিছু কাজে এসেছি। আমি আপনার কাছে কিরাত পড়তে চাই। ছাহেব কিবলাহ বলেছেন- একে তো প্রাত্যহিক ব্যস্ততা, এছাড়া মর্যাদাবান একজন বয়স্ক বুযুর্গ, তাঁর অনেক মুরীদ, কেমনে তাঁকে পড়াবো? প্রথম দফা তাঁকে না করে দিলাম। পরের দিন তিনি আবার এলেন এবং একই অনুরোধ করলেন। আমিও তাঁকে ওযর পেশ করলাম। তখন বললেন, আমি আপনার কাছে এমনি আসিনি, বড় জায়গার আদেশ পেয়ে এসেছি। জানতে চাইলাম, বদরপুরী ছাহেবের আদেশ কি না? বললেন, আরো বড় জায়গার আদেশ। তিনি বলেন, 'স্বপ্নে দেখলাম হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ রেখেছেন। আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুনতে চাই। তখন তিনি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন। আবার আরয করলাম, এরকম তিলাওয়াত কীভাবে শিখবো? তখন আপনার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ছাহেব কিবলাহ বলেছেন, তাঁর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে আমি রাযি হলাম। সময় ঠিক হলো প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ যুহর আদমখাকীর মোকামে বসে পড়া হবে। এখানে অনেক বুযুর্গ আলিম ব্যক্তি ছাহেব কিবলাহ'র কাছে অধ্যয়ন করেছেন। এরপর তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সপ্তাহে একদিন বারগাত্তায় পড়াতেন। সৎপুরও একদিন পড়াতেন। বারগাত্তায় যখন পাঠদান করতেন, তখন আমরা ছোট ছিলাম। দেখেছি পুরো এলাকার ইমাম ছাহেবগণ তাঁর কাছে পড়তে যেতেন।

ছাহেব কিবলাহ (র.) যখন বাড়িতে কিরাত পড়ানো শুরু করেন তখন বর্তমান বাড়িতে এটা ছিল না বরং পুরাতন বাড়িতে ছিল। এ সময় ছাহেবানী অসুস্থ ছিলেন। রান্নাঘরে কাজ করার মতো শারীরিক অবস্থা তখন তাঁর ছিলো না। ছাহেব কিবলাহ তারাবীর নামাযের পর একটি দীর্ঘ মশক দিয়ে ভেতর বাড়িতে গিয়ে (ছাত্রদের জন্যে) খাবার রান্না করতেন। সে সময় একদিন তাঁর হাত পুড়ে গিয়েছিল। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর হাতে কালো দাগ ছিল। একবার আমি বলেছিলাম, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে দেখি এ দাগের জন্য কোনো ঔষধ পাওয়া যায় কি না। বললেন, না বাবা, এটা আমার এক চিহ্ন। কুরআন শরীফ পড়তে আসা লোকদের খিদমাতের জন্য হাত পুড়েছে। ডান হাতের আঙুলের উপর দিকে কালো সে দাগ ছিল। আমি তখন সাহায্যকারী হিসেবে পাশে পাশে থাকতাম। রান্না শেষ হলে বলতেন, যাও, চার রাকাআত নামায (তাহাজ্জুদের নামায) আদায় করো। সবাইকে জাগিয়ে দাও, সাহরীর খাবার প্রস্তুত হয়ে গেছে। সবাই খাবার খেতেন। ধীরে ধীরে ছাত্র

সংখ্যা বাড়তে শুরু হলো। নতুন বাড়িতে ছাপড়া ঘর বানিয়ে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। তখন কিন্তু পড়ানোর সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। একা একা সারাদিন পড়াতেন।

আমি যে বছর কুরআন শরীফ (কিরাত) পড়ি তখন সৎপুরে মুহাদ্দিসে আউয়াল বা শাইখুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলাম। রামাদানের তিন-চার দিন আগে গিয়েছি। মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাকে বললেন, এবার কুরআন শরীফ পড়তে হবে। রোযার আগের দিনের আগের দিন বললেন, যারা কুরআন শরীফ পড়বে, নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এসো। বাড়ি থেকে কোনো মৃত্যুসংবাদ এলে ছুটি পাবে, নতুবা ২৭ রামাদানের আগে কোনো ছুটি নেই। আমাদের এ ব্যাচে বড় ছাহেবজাদা ও মেজো ছাহেবজাদাও ছিলেন। এ ছাড়া হাইদ্রাবন্দের মাওলানা আজিজুর রাহমান ছাহেব, বালাউটের মাওলানা শুয়াইবুর রাহমান ছাহেব, দেওয়ান আবদুল বছির ছাহেব মরহুম। সবার নাম মনে পড়ছে না। ছাহেব কিবলাহ এই জামাতের নাম দিয়েছিলেন খুসুসী জামাত। কোনো নির্দিষ্ট রুটিন ছিল না। যখন ডাকতেন তখনই ক্লাস শুরু। প্রতিদিন তিন-চার বার করে সবক শুনতেন। ডাক দিলেই আমি গিয়ে বড় ছাহেব ও মেজো ছাহেবের দরজায় নক করতাম। তারাও তড়িঘড়ি করে আসতেন।

আমি একদিন ছুটি পেয়েছিলাম। একটি স্বপ্ন দেখলাম, বড় আজব (আশ্চর্যজনক)। ছাহেব কিবলাহকে একা পাওয়ার সুযোগ নেই। তখন বাইরের ঘরে কারী আলতাফুর রহমান ছাহেব (ছাহেব কিবলাহ'র সেক্রেটারি) যে রুমে থাকতেন সেই রুমে থাকি। আসরের পর রুমে বসে রয়েছি, এ সময় অন্যরা একটু হাঁটাহাঁটি করছেন, কেউবা টুকিটাকি কেনার জন্য দোকানে গেছেন। এমন সময় হঠাৎ করে ছাহেব কিবলাহ রুমে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি কিছু বলবে? আমি স্বপ্নের কথা বললাম। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বললেন– তাবীর আমি করবো না। তুমি আগামীকাল সবক শুনিয়ে চলে যাও গণিপুর। আমার হুযূরের কাছে গিয়ে স্বপ্ন বলে আসবে। আসার পথে রাত হয়ে যাবে, বাড়িতে থাকবে। এই একরাতের ছুটি পেয়েছিলাম। প্রসঙ্গত এই রামাদান শরীফের ৯ দিন আগে আমার রুসুমাত হয়েছে, আকদ আগেই হয়েছিল। এ বছরই ছাহেব কিবলাহ'র কাছে কুরআন শরীফ আউয়াল আখির শুনিয়েছি। বড় দুই ছাহেবজাদাও আমাদের সহপাঠি ছিলেন। এরপরের বছর থেকে তারা উভয়ই একটু একটু করে ছাহেব কিবলাহকে পড়ানোতে সহযোগিতা শুরু করেন। আমাকেও তখন থাকতে হতো সহযোগিতার জন্য। এর অনেক বছর পর সিলেট শহরের সুবহানীঘাটে দারুল কিরাত শুরু হলে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে সেখানে পাঠান।

ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর মানবপ্রেম

ছাহেব কিবলাহ'র সাথে চলেছি, (এসব) কত যে দেখেছি কোনটি বলবো। কত ঘটনা! ছোট ছোট হলেও এসব ঘটনার পরিমাণ যথেষ্ট। গাছবাড়িতে ছাহেব কিবলাহ যখন পড়াতেন, তখনো আমাদের জকিগঞ্জী রাস্তায় গাড়ি চলতো না, রাস্তার কাজ পুরো হয়নি। যে বৃহস্পতিবারে বাড়িতে যেতাম ছাহেব কিবলাহ'র নৌকা আসতো, তাতেই যেতাম। দেখতাম, মরিচ বাটার পাটা, পুতাইল (শিলনোড়া) আরো অন্যান্য জিনিসপত্র প্রায়ই কিনতেন। যাবার সময় বলতেন, এগুলো নৌকায় তোলো। আমি মনে মনে বলতাম, ছাহেব কিবলাহ'র বাড়ির কাজের মেয়েরা এতো তাড়াতাড়ি পাটা-পুতাইল (শিলনোড়া) নষ্ট করে ফেলে? প্রায় প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এগুলো কিনতে হয়? পরে জানলাম আসল ঘটনা অন্য রকম। দেখা যেত, সকালে বসেছেন এবং কাজের লোকদের ডেকে একেকটা একেকজনের জন্য পাঠাচ্ছেন। সিলেট থেকে যাকাতের জন্য কাপড়ও কিনে নিয়ে এভাবে বণ্টন করে দিতেন। তিনি যে মানুষের খিদমাত কিভাবে করতেন তা কতো বলবো। বহু ঘটনা দেখেছি। মানুষের প্রতি দরদ আল্লাহপাক তাঁর দিলে ঢেলে দিয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি এক শের বলতেন-

'তরীকত বজুয খিদমতে খালকে নেসত
বসুজ্জাদা তাসবীহ ও দালকে নেসত।'

-হাতে তাসবীহ, কাঁধে মুসাল্লা আর পুরনো ছেঁড়া কাপড় পরে তরীকত হাসিল হয় না। মাখলুকের খিদমাত করতে হয়।

একদিনের ঘটনা। তখন তিনি সৎপুর মাদরাসায় পাঠদান করেন। মাগরিবের নামায শেষ করে ছাহেব কিবলাহ তাঁর রুমে চলে গেছেন। আমি গিয়েছি ইস্তিঞ্জা করতে। দেখি একটি বিড়ালছানা ঢাকনাবিহীন একটি সেনেটারি ট্যাংকিতে পড়ে আছে। কীভাবে এটাকে তুলবো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। ইতোমধ্যে ছাহেব কিবলাহ আমাকে খোঁজ করলেন। হাযির হয়ে আরয করলাম, একটি বিড়ালের ছানা ট্যাংকিতে পড়ে গেছে। বেশি সময় গেলে মরে যেতে পারে। বললেন, তাড়াতাড়ি যাও। যেভাবে পারো দ্রুত এটাকে উদ্ধার করো। আরেক সহযোগীর সাথে অনেক কৌশলে বাঁশের দুটো টুকরো দিয়ে বিড়াল ছানাটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করি, কিন্তু পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ময়লার মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে বিড়াল ছানাটিকে বের করি। সাবান দিয়ে ভালো করে হাত পরিষ্কার করে ছাহেব কিবলাহ'র খিদমাতে হাযির হতেই জিজ্ঞেস করলেন, তুলতে পেরেছো তো? মরে যায়নি তো? বাচ্চাটি সুস্থ আছে তো? কীভাবে তুললে? তারপর বিস্তারিত শুনে বললেন, আজ একটি বড় খিদমাত করেছো। আল্লাহ তোমাকে এগিয়ে দেবেন। সেদিন আমি উপলব্ধি করলাম যে, শুধু মানুষই নয়, একটা জন্তুর জন্যে তাঁর কতো দরদ! এ রকম কতো কী যে দেখেছি! ছাহেব কিবলাহ যতদিন দুনিয়ায় ছিলেন, সৃষ্টির প্রতি তাঁর এসব ভালোবাসাই দেখলাম জীবনভর। ছাহেব কিবলাহ আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রায়ই একটি হাদীস শুনাতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমাকে হুকুম করা হয়েছে, মানুষের মর্যাদামতো যেন তাদের সাথে ব্যবহার করি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ ছাড়া আর কে আদেশ করতে পারে? সুতরাং আল্লাহপাক নবীজিকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন মানুষের মানযিল, মরতবা, মর্যাদা বুঝে ব্যবহার করেন।

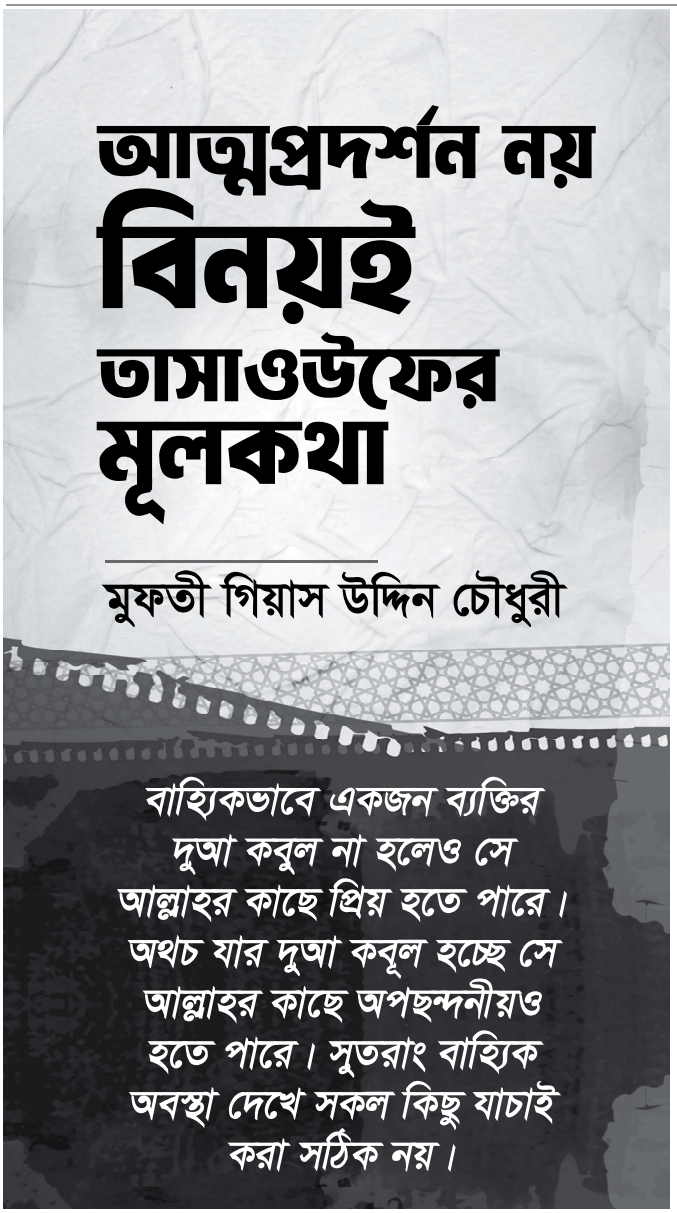
ছাহেব কিবলাহ'র আচার-আচরণে, মানুষের সাথে ব্যবহারে ঠিক এই হাদীস শরীফের পরিস্ফুটন ঘটতো। মাঝে-মধ্যে এই হাদীস পড়তেন আমাদেরকে শেখানোর জন্যে। তাঁর আচরণও ছিল ঠিক হাদীসের অনুরূপ। কাউকে ধমক দিলেও তার মর্যাদা মতো, আদর করলেও তার মর্যাদা মতো করতেন। এমনকি মেহমানদারী করলেও মর্যাদা রক্ষা করতেন বরাবর। মানুষের মর্যাদা, বয়স ও স্তর বুঝে কথা বলতেন এবং আচরণও করতেন ঠিক সেভাবে।

আমার জানামতে মসলকের দিক দিয়ে বিরোধী আলিমগণের মধ্যে ইনসাফ-পছন্দ কেউ কেউ বলতেন, ফুলতলী ছাহেবের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক পাওয়া যায়। মসলকের দিক থেকে ইখতিলাফ পোষণ করলেও এটা স্বীকার করতেন যে, আখলাকে নববীর এক অনুপম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ফুলতলী ছাহেব।

[মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী সম্পাদিত 'আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্মারক' থেকে সংকলিত]

আত্মপ্রদর্শন নয় বিনয়ই তাসাওউফের মূলকথা

মুফতী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী



[নিজেকে উত্তম মনে করার ধারণ থেকেই অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা সাধারণ মানুষের বিপরীত। তারা সবসময় নিজেকে ছোট মনে করেন। আত্মপ্রদর্শন করেন না। সাধারণ পোশাক পরিধান, অল্প আহারে তুষ্টি থাকেন। যারা সম্মান, লিপ্সা ও প্রভুত্ব প্রিয়তা পরিত্যাগ করতে পারেন, তারাই মুত্তাকী বা পরহেযগার। এসব গুণাবলি অর্জনের জন্য তাসাওউফের বিকল্প নেই। ডিসেম্বর-২০২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ এ সংখ্যায় প্রকাশ হলো।-সম্পাদক]

আবুল কাশিম কুশাইরী (র.) একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, আবুল হুসাইন আন নূরী এক লোককে আযান দিতে শুনে বললেন, আল্লাহ তোমাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করুন, মরণবিষ দিন। একটি কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করতে শুনে বলেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির আছি। তাকে বলা হলো এটাতো সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা। কারণ শাহাদাত উচ্চারণের সময় মুআযযিনকে তিনি বর্শাঘাত ও মরণবিষের কথা বলেছেন। অথচ কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার সময় 'আমি উপস্থিত' বলেছেন। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন এই মুআযযিন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করছেন আর এই কুকুরের ক্ষেত্রে আল্লাহ তো বলেছেন, এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসা পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা করে না। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া)

উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে আযান দিচ্ছে কিন্তু সেই আযান খালিস না হওয়ায় উক্ত বুযুর্গ তাকে লানত করেছেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহকে যখন প্রিয় কোনো বান্দাহ ডাকেন তখন তিনি বলেন, জিবরাঈল এখনই আমার বান্দার প্রয়োজন পূরণ করো না। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পছন্দ করি। আল্লাহকে যখন তার অপ্রিয় কোনো বান্দাহ ডাকে তখন তিনি বলেন, জিবরাঈল আমার বান্দার প্রয়োজন পূরণ করে দাও। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে অপছন্দ করি। (ইবন মাযাহ)

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, বাহ্যিকভাবে একজন ব্যক্তির দুআ কবুল না হলেও সে আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে পারে। অথচ যার দুআ কবূল হচ্ছে সে আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়ও হতে পারে। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা দেখে সকল কিছু যাচাই করা সঠিক নয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) আনফাসুল আরিফীন কিতাবে লেখেন, 'আমার ওয়ালিদ মুহতারাম এর একজন খালিস অনুসারী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, মানুষের জীবন কীভাবে অতিবাহিত করা উচিত? জবাবে তিনি বলেছিলেন,

كن فى الناس كااحد من الناس–

অর্থাৎ নিজেকে উত্তম মনে না করে মানুষের মধ্যে নিজেকে সাধারণ মনে করে চলো।

কোনো ব্যক্তিরই নিজের আমলকে নিয়ে গর্ববোধ করা বা আত্মতৃপ্তি লাভ করা উচিত নয়। আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের খোদাভীতি পরিলক্ষিত হয়। আউলিয়ায়ে কিরামের আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ নিম্নোক্ত বর্ণনায় পাওয়া যায়- ইবন আবূ মুলাইকা (র.) বলেন,

أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانِ جِبْرِيلَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ وَمِيكَائِيلَ وَيُذْكَرُ عَنْ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ– (بخاري)

-আমি নবী করীম ﷺ এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, যারা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয় করতেন। তাঁরা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরাঈল (আ.) ও মীকাঈল (আ.) এর তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, নিফাকের ভয় মুমিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিন্ত থাকে। (আত তারীখুল কবীর)

এছাড়া মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাতিব হানযালা আল উসাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, আপনি কেমন আছেন? আমি বললাম, হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি কী বলছেন? তিনি (হানযালা রা.) বলেন, আমি বললাম, যখন আমরা নবী করীম ﷺ এর নিকট অবস্থান করি এবং তিনি আমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তখন এমন অবস্থা হয় যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাই। অতঃপর যখন তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী-সন্তান ও জাগতিক বিষয় নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ি, তখন তার অধিকাংশই ভুলে যাই। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমিও অনুরূপ অবস্থা উপলব্ধি করি। অতঃপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমরা আমার নিকট অবস্থান করার সময়ের মতোই সার্বক্ষণিক থাকতে পারতে অথবা

সার্বক্ষণিক যিকরের মধ্যে থাকতে; তাহলে ফিরিশতারা তোমাদের বিছানায় এবং রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানযালাহ! কিছু সময় এই রকম, কিছু সময় ঐ রকম। (সহীহ মুসলিম ও সুনান আত তিরমিযী; মুসলিমের ভাষ্য, হাদীস-২৭৫০)

বুযুর্গানে দ্বীনের আচার-আচরণ ও বক্তব্যে হাদীসে বর্ণিত বিষয়াবলীতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এর মূল কারণ তাকওয়া বা খোদাভীতি। বর্ণিত হাদীসে সাহাবায়ে কিরামের আচরণের মধ্যে এই খোদাভীতিরই বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের আশঙ্কা করেছেন। এটি মূলত সাহাবায়ে কিরামের এক ধরনের বিনয় প্রকাশ। এ থেকে এ বিষয়ে ওয়াসওয়াসায় পতিত হওয়ার সুযোগ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামও মাঝে মাঝে মুনাফিকিতে নিমজ্জিত হয়েছেন। উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মত হলো, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সব ধরনের নিফাক থেকে রক্ষা করেছেন এবং সকলেই আদিল বা ন্যায়পরায়ণ।

একইভাবে দেখা যায় হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) একজন বড় আবিদ ছিলেন। বিশেষ করে খিলাফতের আড়াই বছর তাঁর আমল ছিল- ইশার পর তিনি তাঁর নির্ধারিত হুজরায় চলে যেতেন। মুসাল্লার উপর নফল ইবাদত ও যিকর আযকারে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। ঘুম আসলে সেখানেই পড়ে থাকতেন। আবার চোখ খুলে আল্লাহর স্মরণে লেগে যেতেন। সকাল পর্যন্ত এভাবেই থাকতেন। অধিকতর ক্রন্দনের ফলে তাঁর চোখদ্বয় লাল হয়ে যেত।

তাঁর ইন্তিকালের পর ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিক তাঁর ঘরে প্রবেশ করল। তার মনে হচ্ছিল ঘরের ভেতর কোনো সম্পদ সংরক্ষিত আছে। কিন্তু দেখা গেল ঘরে একখানা কম্বল ও একখণ্ড জিঞ্জির রয়েছে। ইবাদতের সময় তিনি কম্বলখানা পরতেন আর জিঞ্জির গলায় লাগিয়ে রাখতেন। (তারীখুল ইসলাম)

যে সকল আবিদ-যাহিদ এর ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত ও মুজাহাদার পর অন্তরে কোনো ধরনের অহংকার আসে তাদের উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) এর উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

কুতবুল আকতাব আল্লামা শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

چار چیزیں لے کھڑا جو نادر سرکار ہیں
بیکسی و ناکسی عجز و گناہ بسیار ہیں
رحم کر ہم پر الٰہی اولیاء کے واسطے

-দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অশেষ পাপ নিয়ে রব এই অসহায় আপনার সম্মুখে হাযির। সুতরাং হে আমার রব! আউলিয়াগণের ওয়াসীলায় আমাকে রহম করুন। অন্যত্র বদরপুরী (র.) আরো বলেন,

قال ابتر حال ابتر سب میرے ابتر ہے کام
فضل اپنے سے تو کر دے ملک دیں کا انتظام
مجھ غریب بینوا بے آسرا کے واسطے

-আমার কথাবার্তা, আমার অবস্থা ও কাজ খুবই মন্দ। সাধ্য ও ক্ষমতাহীন আমার সকল দ্বীনী কাজের ইন্তিযাম তুমি করে দাও।

আমার ওয়ালিদ মুহতারাম আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

ہائے میرا دل تماشہ گاہ شیطاں بن گیا
تھا خزینہ نور لیکن قصر شیطاں بن گیا
آنکھ سے آنسو پیتی دلمیں غم کی دور ہے
منتظر ہے دید کا دل میں فسانہ بن گیا

-নূরে নূরান্বিত ছিল যে হৃদয় মন, শয়তানের লীলাভূমি হলো তা এখন।
বেদনা-বিধুর মন চোখে বহে নীর দিদারের প্রতীক্ষায় সতত অধীর।

অন্য এক কবিতায় ওয়ালিদ মুহতারাম আরো বলেন,

شرمساری ہے ہماری جرم کےانبار پر
ہنس رہا شیطاں ہماری خونے بد کردار پر
زندگی برباد میری شامت اعمال پر
بد نصیبی چھا گئی ہے جرم کے اصرار پر

-পাপ-বোঝা বয়ে মরি অপমানে লাজে
ভারী খুশি শয়তান দেখে বদ কাজে।
জীবন হইল মাটি গুনায় গুনায়
ডুবিলাম অফুরান দুঃখ হতাশায়।

কোনো কোনো বুযুর্গানে কিরামকে কোনো নির্বোধ ও অহংকারী ব্যক্তি কেউ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে সেটাকে তারা পছন্দ করতেন।

ইবরাহীম ইবন আদহাম (র.) বলেন, আমার ইসলামে (জীবনে) আমি কেবল তিনবার আনন্দিত হয়েছি, একবার আমি জাহাজে ছিলাম। সেখানে এক কৌতুকপ্রবণ লোক ছিল। আমরা তুর্কিদের দেশে অবিশ্বাসীদের এভাবে পাকড়াও করি- এটা বলে সে আমার মাথার একটি চুল ধরে ঝাঁকুনি দিল। এটা আমাকে আনন্দিত করল। কারণ তার চোখে জাহাজে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ ছিল না।

আরেকবার আমি অসুস্থ হয়ে মসজিদে পড়ে ছিলাম। মুআযযিন এসে আমাকে বের হয়ে যেতে বলল। কিন্তু আমার বের হয়ে যাওয়ার মতো শক্তি ছিল না। তখন সে আমার পা ধরে টেনে হিঁচড়ে মসজিদের বাইরে ফেলে দিল।

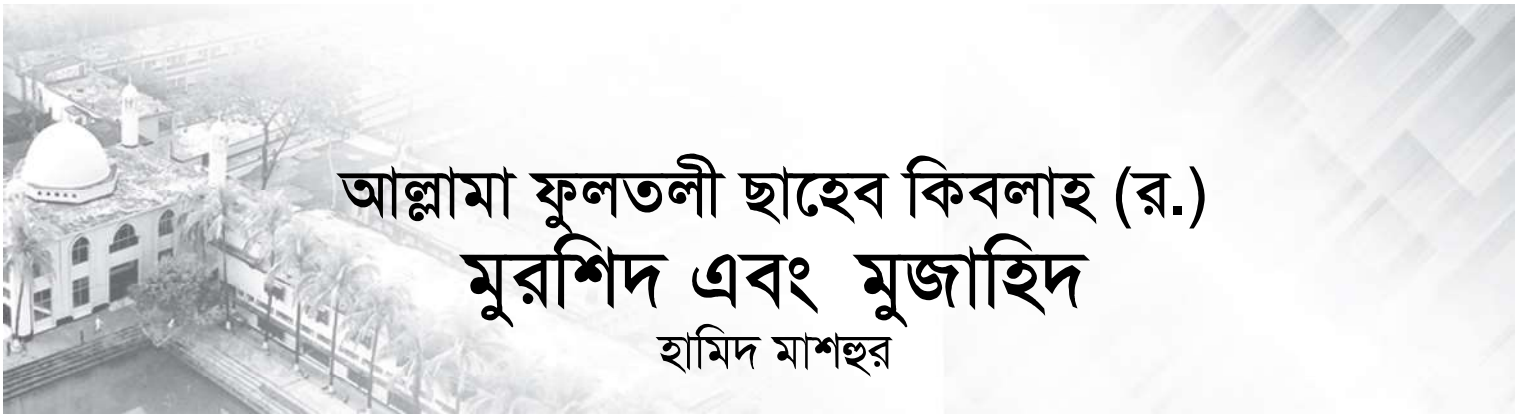
তৃতীয়বার আমি সিরিয়ায় ছিলাম। আমার গায়ে একটি পশমি চামড়া ছিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু তাতে উকুন এত বেশি ছিল যে পশম ও উকুন আলাদা করতে পারলাম না। এতেও আমি আনন্দিত হলাম। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া)

উল্লেখ্য, যারা কোনো কামিল বুযুর্গের মুরিদ হয়ে নিজের মধ্যে বুযুর্গীভাব দেখাতে চান, তারা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলে মা'শুকপ্রীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

১. আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের আমলের ফযীলত সম্পর্কে অবগত থাকা। তাদের সাথে নিজেকে তুলনা না দিয়ে নিজেকে তুচ্ছ মনে করা।

এ ব্যাপারে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) বলেন, আমলের ফদীলতের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য হয় তা আমিল বা আমল সম্পাদনকারীর কারণে, আমলের কারণে নয়। একটি আমলের সাওয়াব ও প্রতিদান দুজন ভিন্ন আমলকারীর কারণে ভিন্ন হয়ে যায়। একই আমল যা আল্লাহর মকবূল ও প্রিয় বান্দাহর দ্বারা সংগঠিত হয় তার সাওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় ঐ ব্যক্তির আমলের তুলনায় যে ব্যক্তি আল্লাহর মকবূল ও প্রিয় নন। আমলকারী যদি অধিকতর বুযুর্গ ব্যক্তি হন তবে আমলের সাওয়াবও অধিকতর হবে। এজন্য অনেকেই বলে থাকেন, আরিফ বা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির লোক দেখানো ইবাদতের সাওয়াব মুরিদের ইখলাসের সাথে সম্পাদিত ইবাদতের চেয়েও বেশি। সুতরাং আরিফ যদি ইখলাসের সাথে ইবাদত সম্পন্ন করেন তাহলে তার ফদীলত যে কতগুণ বেশি হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। (মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী, মাকতুব নং- ৫০৩)

২. কেউ প্রশংসা করতে গিয়ে বুযুর্গ ব্যক্তিদের উপর অন্যদের প্রধান্য দিলে এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া, বরং তার উচিত বাধা প্রদান করা।



আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)
মুরশিদ এবং মুজাহিদ

হামিদ মাশহুর

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর ওফাতের প্রায় সতেরো বছর হতে চলেছে। দীর্ঘ এই সময়ে ছাহেব কিবলাহ (র.)-কে নিয়ে গবেষণা, প্রকাশনা, সেমিনার সব কিছুই হয়েছে বিপুল পরিসরে। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্যের খুঁটিনাটি বহু কিছুই আমাদের সামনে এসেছে অত্যন্ত বিস্তরভাবে। ছাহেব কিবলাহর কর্মময় জীবন নিয়ে প্রকাশিত স্মারকে তার সম্পর্কে নানা মত ও পথের মূল্যায়ন পড়ে যে কেউ অভিভূত হবেন নিশ্চিতভাবে। দীর্ঘ এই সতেরো বছরে এই জনপদে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে যারা ছাহেব কিবলাহ (র.)-কে কাছে থেকে দেখেনি, তার সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তাদের কাছে তাঁকে কিভাবে উপস্থাপন করা উচিত এ নিয়ে চিন্তা থেকেই মনে হলো এই প্রজন্মের মুসলিম তরুণদের কাছে ছাহেব কিবলাহর বিপুল কর্মময় জীবনের কিছু সুনির্দিষ্ট দিক বিশদভাবে আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত রাজনীতি সচেতন এই প্রজন্মের জানা থাকা প্রয়োজন ছাহেব কিবলাহর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা এবং গ্রহণযোগ্যতার আখ্যান, জানা থাকা উচিত তিনি তাঁর সময়ে ঠিক কত উঁচু স্তরের রাজনৈতিক প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। দ্বিতীয়ত নতুন এই প্রজন্ম যখন এদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির নতুন উত্থানের নতুন বয়ান সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছে তখন তাদের জানা থাকা উচিত ব্রিটিশ ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রায় আট দশকের কর্মময় জীবনে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জাগরণে তিনি কী অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন। ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কর্মময় জীবনের উপর ইতোমধ্যে হাজার পৃষ্ঠার স্মারক প্রকাশিত হয়েছে যা থেকে তথ্য আহরণ করে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

১.

বাংলাদেশ, ভারতসহ পশ্চিমা বিশ্বে আল্লামা ফুলতলী (র.)-এর দ্বীনি ইলমের খিদমাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খিদমাত ইলমে কিরাতের খিদমাত। তাঁর সম্পর্কে যারা অল্প বিস্তর জানেন তারা সকলেই এ তথ্য জানেন যে তিনি ইলমে কিরাতের সনদ অর্জন করেছিলেন মক্কা শরীফের প্রখ্যাত কারী শাইখ আহমদ আব্দুল্লাহ আল-হিজাযী (র.) থেকে। ইলমে ক্বিরাত অর্জনের জন্য তিনি ১৯৪৪ সালে পবিত্র মক্কা মুকাররামায় গমন করেন। যে সময় তিনি মক্কা শরীফে গমন করেন তখন তিনি ত্রিশোর্ধ এক তরুণ আলেমে দ্বীন। মক্কায় যাত্রার আগেই তিনি ক্বিরাত শিক্ষা নিয়েছেন স্বীয় পিতা মাওলানা আব্দুল মাজিদ চৌধুরী ফুলতলী (র.), স্বীয় মুরশিদ শাহ সূফী ইয়াকূব বদরপুরী (র.) এবং বিশ্ব বিখ্যাত কারী শাইখ ইরকসুস আল মিশরী (র.)-এর ছাত্র মাওলানা আব্দুর রউফ শাহবাজপুরী (র.)- এর নিকট থেকে। অর্থাৎ আল্লামা ফুলতলী (র.)-এর ইলমে কিরাতের সনদ মক্কায় যাওয়ার পূর্বেই পূর্ণই হয়ে গিয়েছিল । এরও বহু আগে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি স্বীয় মুরশিদ কুতবুল আকতাব শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর খিলাফত ও লাভ করেছেন। ইলমে কিরাতের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন, রামপুর থেকে ইলমে হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং স্বীয় মুর্শিদের কাছ থেকে খিলাফত লাভের পরে তিনি তার শিক্ষা জীবনকে আর দীর্ঘ না করলেও পারতেন। কিন্তু মুরশিদের নির্দেশে একজন সর্বজনগ্রহণযোগ্য আরব উস্তাদের সনদ তাঁর জন্য বৃহৎ পরিসরে ইলমে ক্বিরাতের খিদমাতের পদ্ধতি ও সুযোগ আরো সুগঠিত ও অবারিত করে। এজন্যই তিনি শাইখুল কুররা আহমদ হিজাযী মাক্কী (র.)-এর কাছে একাধারে তিন বছরের অধিক সময় ইলমে কিরাত চর্চা করেন। যে সময় তিনি ইলমে কিরাত অর্জনের জন্য মক্কায় যাত্রা করেন সে সময় ইলম অর্জনে মক্কায় সফর খুব সহজ ছিল না। তিনি সেই বন্ধুর পথ বেছে নিয়েছিলেন বলেই তিনি সারা বিশ্বের লাখো মুসলমানদের সঠিক কিরাত শিক্ষার ওয়াসীলা হয়ে উঠেন, ইলমে কিরাতের এক নীরব বিপ্লব হয়ে যায় এই বাংলায়। আজকের বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় একজন ছাত্র কিরাতের ন্যূনতম কোন যোগ্যতা অর্জন না করেও কামিল পাশ করে মুহাদ্দিস, মুফাসসির কিংবা মুফতী হয়ে যেতে পারছেন। বস্তুত মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলামে ইলমে কিরাত সব সময় উপেক্ষিতই থেকে গেছে। এই বিপুল শূন্যতা পূরণ হয়েছে এই একজন মহামানবের অনন্য অবদান দারুল কিরাতের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাই রামাদানে সিলেটসহ সারাদেশের যেখানেই দারুল কিরাতের শাখা রয়েছে সেখানে লক্ষ্য করা যায় দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বড় বড় মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি। মক্কা থেকে ফিরে এসে তিনি যে দারুল কিরাত শুরু করেন তা কেবল এদেশের ছোট বড় মাদরাসাসমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য ইলমে কিরাতের দ্বার অবারিত করেনি, বরং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদেরও একই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে । তার এ খিদমাত আজ ছড়িয়ে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

এই অংশে প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখা উচিত যে আল্লামা ফুলতলী (র.) যখন ইলমে কিরাত অর্জনের জন্য তিন বছরের অধিককাল মক্কায় অবস্থান করেন সে সময় মক্কায় যাত্রা এবং দীর্ঘদিন অবস্থান করা বেশ খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো। বর্তমান সময়ের মতো কোন শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে তিনি সেসময় পড়তে যাননি, গিয়েছিলেন নিজ খরচে। ইলমে কিরাত অর্জনের জন্য এরকম বিপুল অর্থ খরচের মধ্য থেকে আমরা যেমন আল্লামা ফুলতলী (র.)-এর দ্বীনের রাস্তায় সম্পদ কুরবান করার উদাহরণ পাই, একইভাবে এই বার্তাও পাই যে তিনি মানুষের কাছ থেকে পাওয়া হাদিয়া তুহফার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করেননি। বরং তিনি প্রাথমিক জীবন থেকেই পারিবারিকসূত্রে স্বাবলম্বী ছিলেন। এবং তা এতোটাই ছিলো যে মক্কায় যাত্রা এবং সেখানে তিন বছর অবস্থান করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

কেবল ইলমে ক্বিরাত অর্জন এবং তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই আল্লামা ফুলতলী (র.) এর কৃতিত্ব নয়, বরং তিলাওয়াতের বিকৃতির বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। কেবল একটি হরফের মাখরাজ অবিকৃত রাখতে তিনি নিজের রক্ত দিয়েছেন, তবু তাঁর উস্তাদদের শেখানো তেলাওয়াত থেকে সরে আসেন নি, তিলাওয়াতে কোন বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেননি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাধে আমরা এখন স্পষ্টভাবে জানি দোয়াদ হরফের মাখরাজ নিয়ে তিনি সঠিক মতের উপর ছিলেন । হারামাইন থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তের বিখ্যাত সব কারী ছাহেবদের তিলাওয়াতে কখনোই দোয়াদ হরফ কে যোয়া পড়ার নযীর আমরা দেখি না। শুধু যে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তিনি হকের উপর ছিলেন তা নয়, দ্বীনি যেসব বিষয়ে এদেশের সমকালীন উলামাদের একাংশের সাথে তাঁর মত পার্থক্য হয়েছে এখন আমরা লক্ষ্য করছি তাঁর মতামতই পৃথিবীর সকল প্রান্তের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতামত। উদাহরণ হিসেবে

বলা যায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের কথা। মীলদুন্নবী ﷺ মাহফিল কেবল উপমহাদেশেই পালিত হয় এমন একটি বয়ান আল্লামা ফুলতলী (র.)-এর জীবদ্দশায় তার বিরোধীরা পেশ করতেন, অথচ এখন আমরা জানি সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে আরব কিংবা ইউরোপ-আমেরিকায় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন হয় ব্যাপকভাবে। একইভাবে প্রচলিত মীলাদ মাহফিল শুধু উপমহাদেশেই হয় বলতেন যেসব মাতুরিদী আকীদার দেওবন্দী আলিমরা, তাদের এই বক্তব্যও ভুল প্রমাণিত হয়। আমরা এখন জানি আশআরী-মাতুরিদী আক্বিদার সূফীরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, তারা মীলাদ মাহফিল করেন নিয়মিত। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে যেগুলোতে আল্লামা ফুলতলী (র.)-এর অবস্থানই হক্ব কিংবা জমহুরের প্র্যাক্টিস হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে এখন।

২.

ব্রিটিশ ভারতে আল্লামা ফুলতলী (র.) ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আসাম অঞ্চলের প্রভাবশালী নেতা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরীক দল নেজামে ইসলামের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নেজামে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আতাহার আলী (র.) সেসময় আল্লামা ফুলতলী (র.)-এর কাছ থেকে নানা রকম সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর জমিয়ত এবং নেজামে ইসলামের যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিশেষত পাকিস্তানের নানা প্রান্তের জৈনপুরী সিলসিলার সূফীদের এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে মাওলানা আতাহার আলী (র.) আল্লামা ফুলতলী (র.) এর সহযোগিতা নেন। সেসময় থেকেই ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) জৈনপুরী সিলসিলার সকল সূফীদের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন বিধায় তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনে শরীক হোন। পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি যে কেবল জৈনপুরী সিলসিলার বুজুর্গদের সম্পৃক্ত করতে ভূমিকা রেখেছেন তা নয়, বরং সারা দেশে তার তেজোদৃপ্ত বক্তব্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরি করে। সময়ের পরিক্রমায় পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে সেসময়ের সামরিক শাসকদের নানা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও আপসহীনতার ফলে সামরিক শাসক আইয়ূব খান, মুনায়েম খানদের পক্ষ থেকে বারবার তার কাছে নানাভাবে মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব এলেও তিনি তা ফিরিয়ে দেন।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আল্লামা ফুলতলী (র.) কতোটা বলিষ্ঠ ছিলেন তা বুঝা যায় নানা ইস্যুতে তাঁর আন্দোলনগুলো থেকে। পঞ্চাশের দশকে আসামের শিক্ষা সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সত্তরের দশকে ড. ফজলুর রহমানের 'ইসলাম' নামক বইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মুরতাদ তসলীমা নাসরীনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সহ কোন আন্দোলনেই তিনি নিজ অবস্থান থেকে পিছপা হননি। বরং যা তিনি দাবি করেছেন তা তিনি আদায় করেছেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে আল্লামা ফুলতলী (র.)- এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত যখনই দ্বীনি কোন কারণে এদেশের নানা ঘরানার উলামায়ে কিরাম কোথাও একত্র হয়েছেন তখনই সকলের মধ্যমনি হয়ে বসেছেন তিনি। এখনকার বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক বড় বড় ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা তাত্ত্বিক নেতাদের উপস্থিতিতেও আল্লামা ফুলতলী (র.) নানা সমাবেশে সভাপতির আসন অলংকৃত করতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৭৫ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমন্ত্রণে বাইতুল মুকাররামে অনুষ্ঠিত পীর মাশায়িখ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তিনি। যে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছারছিনার মরহুম পীর ছাহেব মাওলানা আবূ জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.), হাজী শরিয়ত উল্লাহর বংশধর মাওলানা পীর মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়া (র.), আজিমপুর দায়রা শরীফের পীর ছাহেব প্রমুখ। একইভাবে ১৯৭৬ সালে বাইতুল মুকাররামে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মিরাজুন্নবী ﷺ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহিম, মাওলানা আমিনুল ইসলাম সহ নানা ঘরানার উলামায়ে কেরাম। এ দুটি সম্মেলন কেবল উদাহরণ মাত্র। এগুলো থেকে একথাই পরিস্ফুটিত হয় যে আল্লামা ফুলতলী (র.)- যুগের পর যুগ এদেশের সকল ইসলামী রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দের কাছে ছিলেন সমীহের পাত্র, সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার ঠিকানা। ইসলামী রাজনীতির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মহীউদ্দীন খান কিংবা জাতীয় মসজিদের সাবেক খতীব মাওলানা ওবায়দুল হকের মতো ব্যক্তিত্বরা তাঁর কাছে নতজানু হয়ে বসতেন, নানা পরামর্শ নিতেন, তাঁর কর্মপন্থাকে আইডিওলাইজ করতেন বলেই নানা প্রসঙ্গে আল্লামা ফুলতলী (র.) সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন থেকে জানা যায়। এই স্বল্প পরিসরে যুগের পর যুগ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা দুষ্কর । তবে এটুক নিশ্চিতভাবে বলা যায় এদেশের মুসলমানদের অধিকার আদায় এবং ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুরক্ষায় তিনি সব সময় একজন বিচক্ষণ নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বারবার। জীবন স্বায়হ্নে এসেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন সুবিশাল লংমার্চের।

৩.

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর আসাম ভারতের রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখনকার সরকার আসামের সকল মাদরাসাকে আসামের সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আল্লামা ফুলতলী (র.) তখন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক। কিন্তু আসামের মুসলমানদের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ থেকে তিনি সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তখনকার জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতৃত্বে বিপুল প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সেসব সমাবেশে নেতৃত্ব দেন, বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রদান করেন। সেসময় দেখামাত্র তাঁর উপর গুলি বর্ষণের অনুমোদনও দিয়ে রাখে আসাম সরকার । তারপরও এই মর্দে মুজাহিদ থেমে যাননি। ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি সমাবেশে উপস্থিত হতেন এবং বক্তব্য দিতেন। তাঁর নেতৃত্বে ও বক্তব্যের ফলে মাদরাসা সমূহকে সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের অধীনস্থ করার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে রাজ্য সরকার সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন আল্লামা ফুলতলী (র.)- এর আন্দোলনের ফলে যে সব মাদরাসার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রয়েছিল তা যুগের পর যুগ আসামের মুসলমানদের দ্বীনি পরিমণ্ডলে সংঘবদ্ধ রাখতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সে আন্দোলনের প্রায় ৭০ বছর পর হিন্দুত্ববাদী মোদীর রোষানলে আসামের সেসব মাদরাসার স্বকীয়তা এখন আর নেই, এগুলো এখন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বলা চলে। ছাহেব কিবলাহ (র.) সাত দশক আগে যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করলেন, সেই সিদ্ধান্ত মোদীর হিন্দু ভারতে বাস্তবায়ন হওয়া থেকে বুঝা যায় আল্লামা ফুলতলী (র.) কর্তৃক এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কতোটা সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। এই ঘটনা থেকে আরোও স্পষ্ট হয় দ্বীনের স্বার্থে তিনি কখনও আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সীমান্তের কাঁটাতারকে বাধা মনে করেননি, বরং মুসলমানের দ্বীন-ধর্ম যেখানেই বিপন্ন হবে সেখানেই তিনি ছুটে গিয়েছেন নির্ভিকচিত্তে।

৪.

আল্লামা ফুলতলী (র.) দ্বীনের খিদমাতের ক্ষেত্রে যে কেবল জাতিরাষ্ট্রের সীমানা প্রাচীরের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন তা নয়, তিনি তাঁর প্রতিবেশী মুসলমানের জন্যই ঝাপিয়ে পড়েছেন তাও নয় বরং তিনি হাজার মাইল দূরের ইউরোপে পশ্চিমা সংস্কৃতির থাবায় নিজস্ব ঈমান আমল বিপন্ন হওয়া মুসলমানের ▶▶ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

হিন্দুত্ববাদ: মুসলিম বিরোধী সহিংসতার তত্ত্ব

মুহাম্মাদ সায়ীদ

ইসলাম তার প্রারম্ভিক শতাব্দীতেই ভারতে পৌঁছেছে এবং সাম্য ও ন্যায়ের দাওয়াত ছড়িয়েছে। পরবর্তীতে এখানে মুসলিম শাসন শুরু হয় এবং সাড়ে সাতশো বছরের বেশি সময়ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত থাকে। মুসলিম শাসনামলে ভারত হয়ে উঠে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের অনুপম জনপদ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও তৎকালীন দুনিয়ায় ভারতের স্থান ছিলো অগ্রসরমান। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের পতন ঘটে এবং বৃটিশের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানরা নিকট অতীতে শাসকশ্রেণি ছিলো বিধায় ব্রিটিশরা মুসলমানদেরকে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত রাখে। মুসলমানরাও ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ফলে ব্রিটিশ ও মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। মুসলিম শাসনামলে হিন্দুরা ক্ষমতাকাঠামোর কাছাকাছিই ছিলো, তদুপরি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতেও তারা অসমভাবে বাড়তি সুবিধা পেতে থাকে। এসময় হিন্দুরা নিজেদেরকে ভারতের প্রকৃত মালিক হিসেবে আবিষ্কার করতে শুরু করে। তাছাড়া ব্রিটিশের 'ডিভাইড এন্ড রুল' কৌশলের ফলে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বও বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক ভারতে উগ্র ও মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ শাসনের প্রায় সবটুকু সময়জুড়ে বহু পর্যায় ও ধাপ অতিক্রম করে হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলাফল হিসেবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রকাশ্যে আসে শ্রেষ্ঠত্ববাদ, বর্ণবাদ, দখলদারিত্ব ও সম্প্রসারণবাদের ধারণা সংবলিত ভয়াবহ আগ্রাসি, সহিংস ও অপরবিনাশী এক মতবাদ, Hindutva তথা 'হিন্দুত্ববাদ'।

প্রাথমিকভাবে বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় ও পণ্ডিত মদন মোহন মালাভিয়া সহ ভারতের শীর্ষ রাজনীতিবিদদের একাংশ হিন্দু জাতীয় ঐক্যের কথা প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। এই সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্যও সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করে। তবে ১৯২৩ সালে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদকে সর্বপ্রথম Hindutva (হিন্দুত্ববাদ) নামে তত্ত্বীয় কাঠামো দেন মহারাষ্ট্রের বিনায়ক দামোদর সাভারকর Hindutva: Who Is A Hindu? গ্রন্থে। পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদের মতবাদ এম. এস. গোলওয়ালকর সহ আরো অনেকের মাধ্যমে প্রচারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। হিন্দুত্ববাদ হিন্দুর সংজ্ঞায়ন করেছে, তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞায় যারা হিন্দু তাদেরকে ঈশ্বরের মর্যাদা দিয়েছে এবং যারা হিন্দু নয় তাদেরকে নির্মূলের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে, হিন্দুদের 'পবিত্র ভূমির' ধারণা দিয়েছে এবং যারা 'বহিরাগত', তাদেরকে এই ভূমি থেকে বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদ আসলে হিন্দু ধর্ম নয়। হিন্দুত্ববাদ তত্ত্ব মতে এটি হিন্দু ধর্মের চেয়ে প্রশস্ত ধারণা, হিন্দুত্ববাদের একটি অংশ হলো হিন্দু ধর্ম। সাভারকর বলেছেন- Hinduism is only a derivative, a fraction, a part of Hindutva (হিন্দুধর্ম হিন্দুত্ব থেকে উদ্ভুত, এর একটি অংশ এবং একটি শাখা মাত্র)। হিন্দু কে? এই প্রশ্নের জবাবে হিন্দুত্ববাদ বলে- হিন্দু হচ্ছে সে, যে সিন্ধু নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চলকে নিজের কেবল পিতৃভূমি নয় বরং পবিত্রভূমি বলে বিশ্বাস করবে। সাভারকর লিখেছেন- A Hindu means a person who regards this land of Bharatvarsha, from the Indus to the seas, as his Fatherland as well as his Holyland—that is, the cradle land of his religion.

হিন্দুত্ববাদ ৩টি মৌলিক লক্ষ্যে কাজ করে। এগুলো হলো- ১. হিন্দুদের রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা। ২. আফগানিস্তান থেকে শুরু করে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ তথা পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা এবং এর বাইরে তিব্বত ও মিয়ানমার জুড়ে হিন্দু পরিচয় ও অখণ্ড ভারতের ধারণা দৃঢ় করা। ৩. যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে, তাদেরকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা। এই লক্ষ্যসমূহ পূরণের জন্য হিন্দুত্ববাদ 'হিন্দু' এবং 'বহিরাগত' আলাদা করে চিহ্নিত করে। হিন্দুত্ববাদের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতভূমির অভ্যন্তরে উদ্ভূত ধর্মগুলো কাছাকাছি সংস্কৃতির । সে হিসেবে এগুলোকে হিন্দু বলে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু ভারতভূমির বাহির থেকে আগত ধর্মগুলোকে 'অপর' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মকে হিন্দু হিসেবে ধরা হবে এবং মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীদেরকে মনে করা হবে বহিরাগত। এই বহিরাগতদেরকেও হিন্দু হয়ে উঠতে হবে, নতুবা তাদেরকে এই 'পবিত্রভূমি'তে থাকতে দেওয়া হবে না। হিন্দুত্ববাদের অন্যতম তাত্ত্বিক এম. এস. গোলওয়ালকর বলছেন– হিন্দুস্তানে বসবাসকারী বিদেশি জাতিগুলোকে অবশ্যই হিন্দু সংস্কৃতি এবং ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে, এবং হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো ধারণা লালন করতে পারবে না, অর্থাৎ, তাদের আলাদা অস্তিত্ব হারিয়ে হিন্দু জাতির সাথে একীভূত হয়ে যেতে হবে। অথবা তারা দেশে থাকতে পারে কিন্তু পুরোপুরি হিন্দু জাতির অধীনস্থ হয়ে, কোনো কিছু দাবি করা ছাড়াই, কোনো সুবিধা ছাড়াই এবং এর চেয়েও আরো কম, তারা কোনো অগ্রাধিকার পেতে পারবে না—এমনকি নাগরিক অধিকারও নয়। এছাড়া তাদের জন্য অন্য কোনো গতি থাকা উচিত নয়"।

হিন্দুত্ববাদ তার দাবীকৃত ভূমিতে বহিরাগতদের স্বকীয়তাসহ অবস্থান করতে দিতে সম্মত নয়। এক্ষেত্রে সে নাৎসিবাদকে অনুসরণ করতে চায়। নাৎসি মডেলে সে উপমহাদেশের অহিন্দু, বিশেষত মুসলিমদেরকে নির্মূল করার পন্থা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। এম. এস. গোলওয়ালকর বলেছেন-

Germany has also shown how well-nigh impossible it is for Races and cultures, having differences going to the root, to be assimilated into one

united whole, a good lesson for us in Hindusthan to learn and profit by. (জার্মানি দেখিয়েছে যে, মূলগত পার্থক্য থাকা জাতি এবং সংস্কৃতির জন্য একীভূত এবং একক সত্তায় রূপান্তরিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটি আমাদের হিন্দুস্তানের জন্য শেখার এবং উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভালো পাঠ)

একদিকে হিন্দুত্ববাদ নাৎসি মডেলে মুসলিম নিধনের আকাঙ্ক্ষা রাখে, অন্যদিকে 'জায়নবাদ' মডেলে এটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রকৃত মালিকানা দাবি করে। জায়নবাদ যেমন ইয়াহুদী শ্রেষ্ঠত্ববাদের এক বহুমুখী ধারণা, যেটি জায়ন পাহাড়কে ঘিরে কেনানের চারদিকের তথাকথিত 'প্রতিশ্রুত ভূমি' নিয়ে একটি ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর, হিন্দুত্ববাদও ঠিক একইভাবে তিব্বত, মিয়ানমার এবং দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের বিশাল অঞ্চলকে হিন্দুদের ভূমি বলে দাবি করে এবং এর উপর পবিত্রতা আরোপ করে, আর প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে হিন্দুরাই হবে এখানকার শাসক। এম. এস. গোলওয়াল তাই বলেছেন- We Hindus came into this land from nowhere, but are indigenous children of the soil always, from times immemorial and are natural masters of the country. (আমরা হিন্দুরা এই ভূমিতে কোথা থেকে আসিনি, বরং স্মরণাতীতকাল থেকে আমরা সর্বদাই এ দেশের প্রকৃত সন্তান, আর আমরাই এ দেশের প্রাকৃতিক শাসক।) নৃতত্ত্বমতে হিন্দুরা আর্য জাতি এবং উত্তর মেরুতে তাদের আদি নিবাস ছিলো, পরে তারা দক্ষিণ দিকে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অভিবাসন করে। সিন্ধ বা হিন্দ নদীর তীরের অধিবাসী হওয়ার দরুন পরবর্তীতে তারা 'হিন্দু' নামে অভিহিত হয়। এই তত্ত্বে হিন্দুত্ববাদ আস্থা রাখতে পারে না। হিন্দুত্ববাদের চাই সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের দৃঢ় দাবি। বালগঙ্গাধর তিলক ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই নৃতাত্ত্বিক বয়ানকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু হিন্দুত্ববাদের জন্য পুনরুদ্ধারযোগ্য ভূমির প্রত্যয় পাকাপোক্ত করতে গোলওয়ালকর এক অদ্ভুত দাবি করে বসেন। তিনি বলেন হিন্দুরা অভিবাসন করে এই অঞ্চলে আসেনি বরং উত্তর মেরু নিজেই অভিবাসন করে উত্তরে চলে গেছে। তিনি লিখেছেন- It was not the Hindus who migrated to that land but the Arctic Zone which emigrated and left the Hindus in Hindusthan.

শুরুর দিকে সাধারণ হিন্দুদের কাছ থেকে হিন্দুত্ববাদ তেমন কোন সাড়া পায়নি। তবে সাভারকরের হিন্দুত্ববাদ তত্ত্ব ও গোলওয়ালকরের হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনটি শুরুতেই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ লালন করে অগ্রসর হয়েছে। শক্তিশালী মুসলিম শাসক, বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীর (র.) এর আমলের গুপ্তঘাতক সন্ত্রাসবাদী শিবাজীর মারাঠা সাম্রাজ্যের পতাকা ভাগওয়া ধ্বজ (গেরুয়া রঙের পতাকা) কে নিজেদের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করে এবং কর্মীদেরকে শিবাজীর চেতনায় উজ্জীবিত করে। ১৯২৭ সালে সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ১০০ জনে পৌঁছলে এটি প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে মুসলিম বিরোধিতা শুরু করে, মসজিদের সামন থেকে ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করার মাধ্যমে। পরবর্তীতে দীর্ঘসময়ব্যাপী আরএসএস এর নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতায় সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দুত্ববাদ। আরএসএসের প্রচেষ্টায় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক, শিক্ষাসংক্রান্ত, ভাষাগত ও পেশাগত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্রিয় হিন্দুত্ববাদের আদর্শ লালন করা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে 'সংঘ পরিবার' নামে একটি জোট তৈরি হয়। সংঘ পরিবারের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করে, ভারতের বিরাট বৈশ্বিক ডায়াসপোরাকে সংঘবদ্ধ করে হিন্দুত্ববাদের সমর্থন নেয়, দেশটির বিশাল জনসংখ্যার বাজার হারানোর ঝুঁকি নির্দেশ করে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে করায়ত্তে রাখে। এর অন্তর্গত বিভিন্ন থিংক ট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আছে, এগুলো হিন্দুত্ববাদকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সহায়তা করে ও একাডেমিয়াকে হিন্দুত্ববাদের অনুকূলে পুনর্বিন্যাস করে। হিন্দুত্ববাদের জন্য কাজ করে এমন দুটি থিংট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান হলো- হিন্দু বিবেক কেন্দ্র ও অল ইন্ডিয়া হিস্ট্রি রিফর্ম প্রজেক্ট। হিন্দু বিবেক কেন্দ্রের প্রধান কাজ হলো হিন্দুত্ববাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেওয়া, এই মতবাদ সংক্রান্ত উপকরণ ভারতের মধ্যে ও বিদেশে একাডেমিক মহলে পৌঁছানো এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে হিন্দুত্ববাদ সংশ্লিষ্ট লেখালেখি ও প্রতিক্রিয়ার উপর নযর রাখা। আর অল ইন্ডিয়া হিস্ট্রি রিফর্ম প্রজেক্ট ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্লিখন করে ও ভারতের ইতিহাস কে নির্দিষ্ট জাতিয়তাবাদী মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে উপস্থাপনের জন্য কাজ করে। বর্তমানে এই প্রজেক্টের সাথে জড়িত চরম হিন্দুত্ববাদী শিক্ষাবিদদেরকে ভারতের জাতীয় পাঠ্যক্রম প্রণয়ন সংক্রান্ত দায়িত্বে বসানো হচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদ যে ইতিহাস পুনরুৎপাদন করছে, তাতে প্রাচীন ভারতকে দেখানো হয় শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশ হিসেবে, যেখানে পুরো পৃথিবী অসভ্য, হিন্দুরা সভ্য এবং তারাই বাকি পৃথিবীকে সভ্যতা শিখিয়েছে। পক্ষান্তরে মধ্য যুগে মুসলিম শাসন ছিলো বর্বর ও মন্দির-প্রতিমা বিধ্বংসী। এই ইতিহাসে বখতিয়ার নালন্দা বিহার ধ্বংস করেন, আওরঙ্গজেব হিন্দু নির্যাতন করেন, মুসলমানরা বহিরাগত ও ভারতের শত্রু। অবশ্য হিন্দুত্ববাদের স্বার্থে এমন ইতিহাস বিকৃতি নতুন কিছু নয়, এটি এই মতবাদের শুরু থেকেই হচ্ছে । নামাযের সময় মসজিদের সামনে গান গাওয়া ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর হিন্দু সাম্প্রদায়িক উগ্রতার যে অতীত ইতিহাস, হিন্দুত্ববাদের তাত্ত্বিক গোলওয়ালকর নিজেদের মতবাদের অনুকূলে সমর্থন হাসিল করার জন্য এটিকে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের সাধারণ শোভাযাত্রার গান-বাজনা বিরোধিতা হিসেবে দেখিয়েছেন। ফলে এই প্রসঙ্গে তিনি এভাবে উপসংহার টেনেছেন- মসজিদের সামনে গান-বাজনার বিরোধিতা মূলত হিন্দুদের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত থাকার এবং মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে স্বাধীন সেল গঠন করার একটি ছুতো মাত্র। এই উপসংহার মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করার প্রয়োজনীয়তাকে তীব্রতর করে দেখিয়েছে এবং হিন্দুদেরকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছে যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যেকোন মূল্যে এই শত্রুকূলকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। গোলওয়ালকর হিন্দুত্ববাদীদের জাগরণের বর্ণনা দিচ্ছেন, বলছেন দুনিয়াকে দেখতে হবে হিন্দুরা তাদের শত্রুকূলকে নিশ্চিহ্ন করছে— He is rousing himself up again and the world has to see the might of the regenerated Hindu Nation strike down the enemy's hosts with its mighty arm.

হিন্দুত্ববাদীরা শিক্ষাব্যবস্থাকে অবলম্বন করে হিন্দুত্বের প্রচার ঘটানোর জন্য বিশেষ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে। এই উদ্দেশ্যে গোলওয়ালকরের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'গীতা মডেল স্কুল' নামে কিছু বিদ্যালয় । ১৯৪৮ সালে সরকার এই স্কুলগুলোকে নিষিদ্ধ করে। এরপর ১৯৫১ সালে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল জন সংঘের প্রথম সম্মেলনেই ঘোষিত হয়েছিলো হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতিকে ধারণ করে এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নই হবে দলের প্রধানতম কর্মসূচি। এর ফলে আরএসএস দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গড়ে তোলে 'অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান', যা 'বিদ্যাভারতী' নামে পরিচিত। সারা ভারতজুড়ে বিদ্যাভারতীর অধীনে রয়েছে প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এগুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ৩৩ লাখ। এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে প্রবল ঐকান্তিকতার সাথে হিন্দুত্ববাদে দীক্ষিত করা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত সযত্নে হিন্দুত্ববাদ সংশ্লিষ্ট কসরতে অভ্যস্ত করা হচ্ছে। অন্যদিকে ১৯৪৯ সালে হিন্দুত্ববাদীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলো 'অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ'। ৭৬ বছর ধরে এই পরিষদটি সক্রিয় রয়েছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। এই বিরাট সংখ্যাক কর্মী বাহিনী ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা ছড়ানো, দাঙ্গা সৃষ্টি, হিজাব বিরোধী ক্যাম্পেইন ও হিজাব পরিহিতা

শিক্ষার্থীদের হেনস্তায় অব্যাহতভাবে তৎপর রয়েছে। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম বিদ্বেষের ব্যাপারে নোয়াম চমস্কি বলেছেন-

"The assault is taking other forms as well, including a general attack on independent thought and the educational system primarily directed against Muslim victims, but by now expanding beyond

(এই অত্যাচার অন্যান্য রূপও ধারণ করছে, এর মধ্যে রয়েছে স্বাধীন চিন্তায় সাধারণ আক্রমণ। আর শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাথমিকভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বরং এটি এখন আরো দূর সীমায় সম্প্রসারিত হচ্ছে।)

হিন্দুত্ববাদ তত্ত্ব অনুযায়ী যেহেতু বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম সমরূপ 'হিন্দু' সংস্কৃতির ধর্ম, তাই এই ধর্মগুলোকে হিন্দুত্ববাদের প্রতি বিশ্বস্ত করে তুলতে সংঘ পরিবার বহুবিধ সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর ফলস্বরূপ ভারতে এখন জৈন অনুসারীরা নিচু শ্রেণির হিন্দুতে পরিণত হয়েছে, আর বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা হয়ে গেছে হিন্দু ধর্মেরই উপধারার মত। শিখদের ব্যাপার একটু ভিন্ন। ১৯৮৬ সালে আরএসএস শিখদেরকে হিন্দুত্ববাদী বানাতে 'রাষ্ট্রীয় শিখ সংঘ' প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু আরএসএসের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে 'শিখরা মূলত হিন্দু' বলে ঘোষণা করলে, ২০০৪ সালে শিখদের ঊর্ধ্বতন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ 'অকাল তখত' রাষ্ট্রীয় শিখ সংঘকে শিখ ধর্ম বিরোধী বলে ঘোষণা জারি করে, যা এখনো বলবৎ রয়েছে। এদিকে শিখদের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর 'আকালি শিরোমনি দল' দীর্ঘসময় ধরে আরএসএসের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। আরএসএসের সাথে এর আদর্শিক দ্বন্দ্ব খুব একটা নেই, তবে দলটি রাজনৈতিক দ্বন্দে ২০২০ সালে আরএসএসের প্রধানতম রাজনৈতিক দল বিজেপি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাছাড়া শিখদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র 'খালিস্তান' প্রতিষ্ঠার দাবি করে শিখদের একটি অংশ। এরা হিন্দুত্ববাদকে ঘৃণা করে, তবে এই অংশ শিখদের মধ্যে সংখ্যালঘু। সবকিছু মিলিয়ে হিন্দুত্ববাদের জন্য শিখদেরকে হিন্দুত্বে একীভূত করা এখনো কিছুটা জটিল। মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য সংঘ পরিবারের বিশেষ কার্যক্রম চলমান। ২০০২ সালে আরএসএসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায় মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ (National Front of Muslims)। এই সংগঠনটি মুসলমানদেরকে আরএসএসের প্রতি অনুগত করা, গরুযবাই নিষিদ্ধ করা, 'বন্দেমাতরম' সংগীতকে গ্রহণযোগ্য বলে প্রচার করা, জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ ক্ষমতা সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৭০ আর্টিকেল বাতিল করা, কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রার জন্য স্থান বরাদ্দের দাবি সমর্থন করা, নরেন্দ্র মোদির পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো, যোগ ব্যায়ামকে নামাযের মত বলে দাবি করে এটিকে হালাল করার মত বহুবিধ হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদের জিঘাংসা অত্যন্ত লোমহর্ষক। মুসলিম নিধনের জন্য হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবারের বহুবিধ সুপরিকল্পিত ম্যাকানিজম রয়েছে, যারা ভারতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ভিতর-বাহির সবদিক থেকে নির্মূল করতে কাজ করে যাচ্ছে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (Vishva Hindu Parishad), সংক্ষেপে যাকে ভিএইচপি বলা হয়। এই সংগঠন ধর্মান্তরিতদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা, বেনারসের জ্ঞানবাপী মসজিদ (যাকে হিন্দুরা বলে কাশী) ও উত্তরপ্রদেশের শাহী ঈদগাহ (যাকে হিন্দুরা বলে মথুরা) সহ বিভিন্ন মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরের পরিকল্পনা করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার উদ্দেশ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করা, মুসলমানদেরকে জমি কিনতে বাধা দেওয়া, 'গোরক্ষা' আন্দোলনের নামে গরু যবাই করতে বাধা দেওয়ার মত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ভিএইচপির যুব শাখা 'বজরঙ দল' এবং নারী শাখা 'দুর্গা বাহিনী', এই দুটি শাখার কর্মীদের মাধ্যমে ভিএইচপি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা করে। মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে টার্গেট এরিয়া অভিমুখে বজরঙ দলের সন্ত্রাসীরা মিছিল বের করে এবং দুর্গা বাহিনীর নারীরা মিছিলের সামনে থাকে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে তাদের এলাকায় ঢুকে পড়ে, এতে মুসলিমরা কোনো ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখালে নারীদের উপর আক্রমণ হয়েছে বলে পেছন থেকে বজরং দলের সন্ত্রাসীরা নারী-শিশু নির্বিশেষে মুসলমানদের উপর নৃশংস আক্রমণ শুরু করে। এছাড়াও ভারতে প্রতিনিয়ত মুসলিম বিরোধী দাঙ্গাগুলো রাজনৈতিকভাবে হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা মদদপুষ্ট হয়। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়ার পর জনতোষণমূলক রাজনীতির অংশ হিসেবে আরএসএসের পরিকল্পনায় বিজেপি নেতারা রাম জন্মভূমি উদ্ধার আন্দোলন শুরু করলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এর আগেও একাধিকবার হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। যেমন ১৯৮৩'তে আসামের নেলিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সরকারি মতে ১,৮১৯, বেসরকারি হিসেবে ৩,০০০ বাঙালি মুসলমানকে হত্যা করা হয়। এবং সেদিনের গণহত্যার ৮০ শতাংশই ছিল নারী ও শিশু। ১৯৮৯ সালে বিহারের ভাগলপুরে ভিএইচপির মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগানকে কেন্দ্র করে একতরফা উস্কানিতে সৃষ্ট দাঙ্গায় ১০০০ জন মুসলিম ও ১০০ হিন্দু নিহত হয়। ১৯৯২-৯৩ সালে মুম্বাইয়ে একতরফা সংখ্যালঘু হত্যা ও লুটপাট চালায় আরএসএস ও বজরঙ দল, এতে নিহতের সংখ্যা ছিলো ৯০০ জন। ২০০২ সালে নরেন্দ্র মোদীর প্ররোচনায় গুজরাটে গণহত্যা সংঘটিত হয়, এতে নিহত হয় অন্তত ২ হাজার জন, যার বেশিরভাগই মুসলিম । আরো ২৫০০ জনের বেশি লোক আহত হয়েছে এবং নিখোঁজ হয়েছে ২২৩ জন। ২০০৭ সালের অক্টোবরে রাজস্থানের আজমীরে খাযা মঈনুদ্দীন চিশতীর দরগায় আরএসএস বোমা হামলা চালায়। বজরঙ দল ও শ্রীরাম সেনা নামের সংগঠন দুটি ২০০৮ সালে কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, চার্চ ও তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। ২০১৮ সালের মে মাসে হায়দারাবাদের মক্কা মসজিদে পাইপ বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরএসএস ও বজরঙ দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসীরা দিল্লিতে মুসলমানদের উপর হামলা করে। ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গায় ৫৩ জন নিহত হয়। বিশ্বজুড়ে নিন্দিত উল্লিখিত ঘটনাগুলো ছাড়াও প্রতিনিয়ত ভারতে হিন্দুত্ববাদের সহিংসতায় মুসলমানদের প্রাণ যাচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মসজিদ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা। এই নৃশংসতা থেকে ভারতের খ্রিষ্টানরাও রেহাই পাচ্ছেন না, যদিও এর হার মুসলমানদের চেয়ে অনেক কম। লাগাতার ৩ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সরকারের আমলে চরম বর্ণবাদী হিন্দুত্ববাদের দ্বারা প্ররোচিত মুসলিম নিধনযজ্ঞ দিনের পর দিন তীব্রতর হচ্ছে। রাজনীতি পর্যবেক্ষকরা বলছেন ২০১৯ সালে কাশ্মীর সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্তন, ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এবং ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি দাঙ্গা— এই তিনটি পরস্পর আন্তসম্পর্কিত ঘটনা হিন্দুত্ববাদের চরম আস্ফালন এবং ভারতীয় মুসলমানদের ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। এডলফ হিটলার জার্মানের বিরাট সংখ্যক ইয়াহুদীদেরকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে দম আটকিয়ে হত্যা করার আগে চেয়েছিলেন 'লাস্ট সলিউশন'। বছর কয়েক পূর্বে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও 'শেষ সমাধান' চেয়েছেন। তাহলে কী তারা ভারতে মুসলিম নিধনের পরিকল্পনা করে এগুচ্ছেন? ভারতে হিন্দুত্ববাদ-প্ররোচিত ইসলামোফোবিয়া ও মুসলিম বিরোধী প্রচারণার যে বাড়বাড়ন্ত দশা, তাতে রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষকরা আশংঙ্কা করছেন হিন্দুত্ববাদীরা একটি গণহত্যা ঘটানোর চেষ্টা করছে। ভারতের পরিস্থিতিদৃষ্টে জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা ড. গ্রেগরি স্ট্যান্টন বলেছিলেন- We are warning that genocide could very well happen in India." (Genocide Watch ওয়েবসাইট)।

হিন্দুত্ববাদ স্বঘোষিতভাবে সম্প্রসারণবাদী (Expansionist)। তাই এটি কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ না থেকে এই মতবাদের দাবিকৃত 'পবিত্র ভূমি'র সবখানে ছড়িয়ে পড়তে সচেষ্ট। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ঘোষিত

প্রকাশ্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন সমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক দ্যা ডিপ্লমেটের ওয়েবসাইটে The Rise of the BJP's Hindutva Ideology in Bangladesh নিবন্ধে বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালে বিজেএইচএম বা হিন্দু মহাজোট গঠনের মাধ্যমে এ দেশে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের শিকড় জন্মেছে এবং তখনই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানের প্রচলন হয়েছে। এরপর থেকে এই সংগঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে এ দেশে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। ২০২০ সালে বিজেএইচএম দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়, প্রভাস-পলাশ এবং গোবিন্দ প্রামাণিকের নেতৃত্বাধীন দুটি গ্রুপ। দলটির দুই গ্রুপই হিন্দুত্ববাদকে নিজেদের আদর্শ বলে স্বীকার করে। হিন্দু মহাজোটের এক নেতার মতে ভারতের হিন্দুত্ববাদের প্রতীক, যেমন 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, ক্রুদ্ধ হনুমানের ছবি, রামনবমীর মতো অনুষ্ঠান এবং লাভ জিহাদের মতো ইস্যুগুলো বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে ২০২২ সাল থেকে। ২০২৩ সালে জাতীয় হিন্দু ছাত্র মহাজোট বাংলাদেশে নিজেদের প্রথম হিন্দুত্ববাদী (হিন্দুত্ববাদের অনুসারী) ছাত্রসংগঠন হিসেবে পরিচয় দেয়। হিন্দু ও হিন্দুত্ববাদ রক্ষা করাই তাদের লক্ষ্য বলে জানায় এই মহাজোট। এ জোটের নেতারা দাবি করেছেন, হিন্দুত্ববাদ তাঁদের আদর্শ ও 'জয় শ্রীরাম' তাদের স্লোগান, কিন্তু তারা বিজেপির সঙ্গে সংযুক্ত নন। বিজেএইচএমের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন রনি রাজবংশী ২০২৩ সালে মহাখালী স্বয়ংসেবক ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) নামে একটি সংগঠন করেন। স্বেচ্ছাসেবক অর্থে সংস্কৃত 'স্বয়ংসেবক' শব্দটি ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী আরএসএস ব্যবহার করে। তবে তিনিও দাবি করেন, আরএসএসের সাথে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। চলতি বছর ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর হিন্দুত্ববাদের স্বঘোষিত সমর্থক বিজেএইচএমের প্রবাস-পলাশ অংশের ছাত্র-যুবকর্মীরা গঠন করেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ও পরবর্তী সময়ে সনাতন জাগরণ মঞ্চ।

দ্যা ডিপ্লোম্যাটে প্রচারিত উল্লিখিত উপাত্তগুলো বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনায় মোটেই যথেষ্ট নয়। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা ভারতপন্থি সরকারের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের কার্যক্রম যে অত্যন্ত জোরদার ও কৌশলপূর্ণ হতে পারে, এটি সহজেই অনুমেয়। রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া চিন্ময় দাসকে ছাড়িয়ে নিতে আদালত প্রাঙ্গনে জড়ো হয়ে বিচারপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা ও চরম নৃশংসতার সাথে রাষ্ট্রের আইনজীবীকে হত্যা করার মত ঘটনা থেকে বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের অবস্থা আন্দাজ করা যায়। হিন্দুত্ববাদ আফগানিস্তান থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত নিজেদের 'পবিত্র ভূমি' বলে দাবি করে। এক্ষেত্রে যেহেতু মুসলিমদেরকে তারা বহিরাগত বিবেচনা করে ও তাদের বিনাশ কামনা করে, তাই মুসলিম দেশগুলোতে তাদের কার্যক্রম চালানো হিন্দুত্ববাদের তত্ত্বীয় আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ভারতের অভ্যন্তরে হিন্দুত্ববাদের এমন সুসময়ে এই অঞ্চলে, এবং মূখ্যত বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের কার্যক্রম কৌশলপূর্ণভাবে বেশ জোরদার হয়েছে, এমন ধারণা করা মোটেই অমূলক হবে না। এমতাবস্থায় এই ভয়াবহ ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসি মতবাদের ব্যাপারে সচেতন হওয়া জরুরি। হিন্দুত্ববাদ কেবল মুসলিমদের জন্য আগ্রাসি নয়, বরং এটি খোদ হিন্দু ধর্মের মূলধারার জন্যও বিপজ্জনক মতবাদ। (দ্রষ্টব্য, Bunch of Thoughts by M. S. Golwalkar)। সুতরাং এই ভয়াবহ মতবাদের ব্যাপারে রাষ্ট্র থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায়ে বহুমাত্রিক দূরদর্শিতা না দেখালে, একে প্রশ্রয় দিলে পরিণাম হিসেবে বিরাট মাশুল গুণতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. Hindutva Who Is A Hindu?, Vinayak Damodar Savarkar

২. We or Our Nationhood defined, M. S. Golwalkar

৩. উগ্র হিন্দুত্ববাদ ধর্মীয় বিদ্বেষের নগ্ন নজির, আসাদ পারভেজ

৪. Conceptualizing Islamophobia in India by Sheheen Kattiparambil (আর্টিকেল)

৫. Displacing and Disciplining Muslims in India's Burgeoning Hindu Rashtra by Audrey Truschke (আর্টিকেল)

মুরশিদ এবং মুজাহিদ

১৬ পৃষ্ঠার পর

ঈমানী হিফাযতের কথাও ভেবেছেন সবার আগে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এদেশের বহু মুসলমান নানা কারণে ইউরোপে, বিশেষত ব্রিটেনে, পাড়ি জমান। এদেশের আলেমদের একটা বড় অংশ ইউরোপে অভিবাসনের বিরোধী। ফলশ্রুতিতে ব্রিটেনে অভিবাসী এসব বাংলাদেশী মুসলমানের সেদেশের সাংস্কৃতিক আধিপত্য নিজেদের ন্যূনতম মুসলমানিত্বও হুমকির মুখে পড়ে নিঃসন্দেহে। বাংলা থেকে ইউরোপে মাইগ্রেশন করা হালাল নাকি হারাম এই বিতর্ক থাকলেও যারা মাইগ্রেশন করবে তারা তো আর ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাচ্ছেন না। আল্লামা ফুলতলী (র.)-ই সম্ভবত প্রথম এসব অভিবাসীদের কথা বিবেচনা করে সেখানে দাওয়াতী সফরে যাওয়া শুরু করেন এবং দ্বীনি বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অসংখ্য মসজিদ, প্রতিষ্ঠা করেন বেশ কিছু মাদ্রাসা। তাই আজও ব্রিটেনসহ ইউরোপে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতীয় মুসলিম অভিবাসীদের কাছে আল্লামা ফুলতলী (র.) এক অনন্য শ্রদ্ধার পাত্র। ১৯৭৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের দারুল হাদীস লাতিফিয়া এখন ইউরোপের বাংলাদেশী মুসলমান কমিউনিটি তো বটেই, সকল মুসলমানদের জন্যই একটি বৃহৎ দ্বীনি মারকাজ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে । তিনি যে শুধু ইউরোপেই তার খিদমাত সীমাবদ্ধ রেখেছেন তাও নয়, তিনি আমেরিকায়ও নিজের পদাঙ্ক রেখে গিয়েছেন সগৌরবে। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রামিক শহরে অবস্থিত আল-ইসলাহ মসজিদ সে দেশের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ হিসেবে লাউডস্পিকারে আযান প্রচার করে এবং এক পর্যায়ে সরকারি অনুমোদনও লাভ করে। এই মসজিদের উদ্যোগের মাধ্যমে উৎসাহিত হয়ে এখন যুক্তরাষ্ট্রের আরো অসংখ্য মসজিদের মাইকে আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আল্লামা ফুলতলী (র.)-এর সুদূরপ্রসারী চিন্তা চেতনাই ইউরোপ-আমেরিকার মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের চেতনা, দ্বীনী শিক্ষার বাতি এখনো প্রজ্জ্বলিত রেখেছে।

আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)- এর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনায় আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি তাঁর মধ্যে তাঁর সিলসিলার বুযুর্গদের নানা গুণের সমাহার ঘটেছিলো। ইলমি খিদমাত আনজাম দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর মতো নিরলস, স্ট্রাটেজিক; রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন শহীদে বালাকোট সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর মত আপোষহীন, অকোতোভয়; দাওয়াতের ময়দানে তিনি ছিলেন কারামত আলী জৈনপুরীর মতো অবিশ্রান্ত আর কোন ইতিবাচক অর্জনের কৃতিত্ব দাবির ক্ষেত্রে শাহ সূফী মাওলানা ইয়াকূব বদরপুরী (র.)-এর মত নিস্পৃহ, বিমুখ। এজন্যই তাঁর দীর্ঘ জীবনের নানা অর্জন আজো পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে। এমন এক নীরব মহান বুজোর্গকে ইসলামী রাজনীতি সচেতন নতুন প্রজন্ম নতুনভাবে খোজে বের করবে বলেই আমার বিশ্বাস।





উযূর মাসাইল

মো. মুহিবুর রহমান

২য় পর্ব

উযূর সুন্নাত আমলসমূহ

সুন্নাত বা সুন্নাহ অর্থ: পদ্ধতি বা অভ্যাস। দ্বীনের মধ্যে অনুসৃত পথ বা পদ্ধতিকে সুন্নাহ বলা হয়। যে আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ পালন করেছেন বা পালন করতে বলেছেন, তা-ই সুন্নাত। এটি পালন করলে সাওয়াব হয়, কিন্তু তা না করলে কোনো গুনাহ হয় না। তবে যথার্থ কারণ ছাড়া ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হতে হয়। সুন্নাত ত্যাগের অভ্যাস করে নিলে গুনাহগার এবং পথভ্রষ্ট হবেন। কেননা আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পাঠিয়েছেন দ্বীনকে মানুষের সামনে ব্যাখ্যা করে শেখানোর জন্য। তিনি বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্য তিনি দ্বীন সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা শরীআহ হিসেবে পরিপালন করা উম্মাতের জন্য আবশ্যক। তাছাড়া কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى– إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى-আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এটাতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।[১] অর্থাৎ তিনি ওহী ছাড়া কিছু বলেন না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব শিক্ষা দিয়েছেন, তা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত নির্দেশসমূহ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি পর্যায়ের হয়ে থাকে। তা পালন করা ঈমানের দাবি। উযূর ফরয চারটি, যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ উযূর ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যা পালন করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। 'উযূর মাসাইল পর্ব-১' এ উযূর ফরযসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

এ পাঠে উযূর সুন্নাত আমলসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. নিয়ত করা

উযূর পূর্বে এমন কোনো ইবাদতের নিয়ত করা সুন্নাত, যে ইবাদত তাহারাত ব্যতীত সহীহ হয় না। অথবা নাপাকি হতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত বা আল্লাহর আদেশ পালনের নিয়ত করা সুন্নাত।[২] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

-প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।[৩]

উযূতে নিয়ত করার উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে সাওয়াব অর্জন করা। কারণ নিয়তের মাধ্যমে উযূ ইবাদতে পরিণত হয়। যদি কেউ নিয়ত ছাড়া উযূ করে, তবে তার উযূ সঠিক হবে কিন্তু সে উযূর জন্য সাওয়াব পাবে না। উযূর নির্দেশসম্বলিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুখ ধোয়া, হাত ধোয়া, পা ধোয়া এবং মাথা মাসেহ করার কথা বলেছেন। কিন্তু নিয়তের শর্ত আরোপ করেননি।

২. শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

উযূ শুরু করার সময় "বিসমিল্লাহ" বলা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

-ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না, যে সঠিক ভাবে উযূ করে না। আর ঐ ব্যক্তির উযূ হয় না, যে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে না)।[৪]

এক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) অথবা 'বিসমিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ' (بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) যে কোনো একটি পড়া যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِنْ حَفِظَتَكَ لَا تَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ

-হে আবূ হুরাইরা! যখন তুমি উযূ করবে, তখন বলো, 'বিসমিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ।' কারণ তোমাকে রক্ষাকারী ফেরেশতা তোমার জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তুমি সেই উযূ ভঙ্গ করো।[৫]

৩. কবজি পর্যন্ত তিনবার হাত ধোয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

-তোমাদের কেউ রাত্রে জাগ্রত হলে সে যেন নিজের হাত তিনবার না ধুয়ে (পানির) পাত্রে হাত ডুবিয়ে না দেয়। কারণ তার জানা নেই (ঘুমের অবস্থায়) তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।[৬]

উযূর শুরুতে উভয় হাত ধোয়া সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা হয়। এখানে হাত ধোয়াকে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে তিনটি মতামত পাওয়া যায়:

এক. কিছু ফকীহ এ বিষয়ে সাধারণভাবে যে কোনো ধরনের ঘুম থেকে উঠে পাত্রে হাত ডুবানোর আগে উভয় হাত ধোয়ার কথা বলেছেন।

দুই. আবার কেউ কেউ নির্দিষ্ট শর্ত আরোপ

করেছেন। তাদের মতে, কেউ যদি পাথর ব্যবহার করে ইস্তিঞ্জা করে অথবা অপবিত্র শরীর নিয়ে ঘুমায়, তাহলে তার জন্য ঘুম থেকে উঠে আগে উভয় হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে এই হুকুম। তবে যদি কেউ নিশ্চিতভাবে পবিত্র অবস্থায় থাকে এবং পানি ব্যবহার করে ইস্তিঞ্জা করে ঘুমায়, তার জন্য এটি সুন্নাত নয়।

তিন.অন্য মত অনুযায়ী, ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তি এবং জাগ্রত না হওয়া ব্যক্তি উভয়ের জন্যই উযূর শুরুতে উভয় হাত ধোয়া সুন্নত। এই মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূ করার বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁরা প্রথমেই হাত ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এবং যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা ছিল তাঁর সাধারণ অভ্যাস ও নিয়ম, শুধুমাত্র ঘুম থেকে জাগ্রত অবস্থার উযূ নয়। বরং স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, তাঁরা নবীজির ঘুম ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় উযূ করার ওপরই অবগত ছিলেন। তবে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া এবং অপবিত্রতার সন্দেহ থাকলে এটি সুন্নত হিসেবে অধিক গুরুত্ব পায়।[৭]

তবে অন্যান্য হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উযূর বিবরণ দিতে গিয়ে নিজে উযূ করে দেখিয়েছেন। উক্ত হাদীসে এসেছে,

فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

-তিনি তিনবার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন।[৮]

৪. মিসওয়াক করা

উযূতে কুলি করার সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত । তিক্ত গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক তৈরি করা ভাল। কেননা তিক্ত বস্তু দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁত মজবুত হয় এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় ।[৯] মিসওয়াক করার জন্য পিলু গাছের শিকড়, যয়তুন বা নিম গাছের ডাল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় । সাধারণ অবস্থায় মিসওয়াকের ক্ষেত্রে হাতের আঙুল গাছের ডালের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কিন্তু ডাল না পাওয়া অবস্থায় ডান হাতের আঙুল ডালের স্থলাভিষিক্ত হবে।[১০] মহিলাদের ক্ষেত্রে লাসাযুক্ত দ্রব্য মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে।[১১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

-আমার উম্মাতের জন্য বা লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম,তাহলে প্রত্যেক সালাতের সাথে তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[১২]

৫. তিনবার কুলি করা

উযূতে তিনবার কুলি করা সুন্নাত। কুলি করার নিয়ম হলো, মুখ ভরে পানি নিয়ে কুলি করা।[১৩] গড়গড়াসহ ভালো করে কুলি করা সুন্নাত। উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উযূর বিবরণ দিতে গিয়ে নিজে উযূ করে দেখিয়েছেন। উক্ত হাদীসে এসেছে,

فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ

-তিনি তিনবার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন।[১৪]

৬. তিনবার নাক পরিষ্কার করা

নাকে পানি দেওয়ার নিয়ম হলো নাকের নরম গোশত পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়ে দেওয়া।[১৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

-যে ব্যাক্তি উযূ করে, সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইসতিনজা করে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে।[১৬]

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া পৃথক সুন্নাত। এ ব্যাপারে দলীল হলো নিম্নের হাদীস:

عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ– يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ.

-তালহা (রা.) তাঁর পিতা হতে তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এমন সময় গেলাম যখন তিনি উযূ করছিলেন, উযূর পানি তাঁর মুখ ও দাড়ি গড়িয়ে তাঁর বুকের উপর পড়ছিল। আমি দেখলাম, তিনি পৃথকভাবে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন।[১৭]

কুলি করা এবং নাক পরিষ্কারের ক্ষেত্রে গভীরভাবে ভালো করে পরিষ্কার করা উচিত। তবে যদি কেউ রোযাদার হয়, তাহলে গভীরভাবে পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে।[১৮] এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে। রোযাদারদের জন্য অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যাতে পানি গিলে ফেলার সম্ভাবনা না থাকে এবং রোযা নষ্ট না হয়।

৭. ঘন দাড়ি খিলাল করা

উযূর সময় ঘন দাড়ির মধ্যে পানি পৌঁছানোর জন্য আঙুল দিয়ে চিরুনির মতো খিলাল করা সুন্নাত। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস হলো:

عن عثمان بن عفَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُخَلِّلُ لحيتَه

-উসমান ইবন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন।[১৯]

৮. হাত ও পায়ের আঙুলসমূহের মধ্যখানে খিলাল করা

উযূর সময় হাত ও পায়ের নির্ধারিত সীমানার সকল স্থানে পানি পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আঙুলসমূহের মধ্যখানে খিলাল করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إذا تَوَضَّأْتَ، فخَلِّلْ أصابعَ يَدَيكَ ورِجْلَيكَ

-উযূ করার সময় তোমার হাত ও পায়ের আঙুল খিলাল করবে।[২০]

৯. ধোয়ার অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধোয়া

উযূতে ধোয়ার অঙ্গ অর্থাৎ উভয় হাত, মুখ এবং উভয় পা তিনবার করে ধোয়া সুন্নাত। উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উযূর বিবরণ দিতে গিয়ে নিজে উযূ করে দেখিয়েছেন। উক্ত হাদীসে এসেছে,

فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

-তিনি উভয় হাতের তালুতে পানি ঢেলে তা তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর মাথা মাসহ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন।[২১]

নিম্নোক্ত হাদীসটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

عن عليّ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا

-আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন।[২২] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই বিষয়ে উসমান, আয়িশা, রুবায়্যি, ইবন উমর, আবূ উমামা, আবূ রাফী, আবদুল্লাহ ইবন আমর, মুআবিয়া, আবূ হুরাইরা, জাবির, আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ, উবাই ইবন কাব (রা.) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাধারণভাবে আলিম ও ফকীহগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেন। প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধোয়া যথেষ্ট, দুইবার করে ধোয়া উত্তম, আর সর্বোত্তম হলো তিনবার করে ধোয়া। এই বিষয়ে এরপর আর কিছু করণীয় নেই। ইবন মুবারাক (র.) বলেন, তিনবার থেকেও বেশি যদি কেউ ধোয়, সে গুনাহগার হবে বলে আমার মনে হয় না (অর্থাৎ তাঁর মতে, এতে গুনাহ হবে)। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেন, সন্দেহপ্রবণ লোক ছাড়া তিনবারের অতিরিক্ত কেউ ধোয় না।[২৩]

১০. একবার মাথা মাসেহ করা

পুরো মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত। উযূতে ধোয়ার অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধোয়া সুন্নাত কিন্তু মাথা মাসেহ একবার করা সুন্নাত। পূর্বে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (র.) বর্ণিত হাদীসে উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর বিবরণ দিতে গিয়ে নিজে উযূ করে দেখিয়েছেন। সেখানে উভয় হাত, মুখ এবং উভয় পা তিনবার করে ধোয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে বলেছেন: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ -এরপর মাথা মাসেহ করলেন।[২৪] এখানে 'তিনবার' কথাটি বলেননি। সুনান আবী দাউদে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে একবার মাথা মাসহ করার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا

تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

-আব্দুর রহমান ইবন আবী লাইলা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা আমি আলী (রা.) কে উযূ করতে দেখি। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি একবার মাথা মাসেহ করেন। অবশেষে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপে উযূ করতেন।[২৫]

তিনবার মাসেহ করা মাকরূহ।[২৬] কেননা মাসেহ তিনবার করা হলে সেটা ধোয়ার মতো হয়ে যায় । তাই একবার মাসেহ করা সুন্নাত।

পুরো মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি হলো প্রথমে হাতের তালু ও আঙুলগুলো পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে। তারপর মাথার সামনের অংশে উভয় হাতের তিনটি আঙুল রাখা হবে। দুই বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী আঙুল মাথা থেকে উঠিয়ে পৃথক রাখা হবে, যাতে সেগুলো দ্বারা কান মাসেহ করা যায়। এরপর হাতের তালু দিয়ে মুছে মুছে মাথার সামনের দিক থেকে পেছনের দিক পর্যন্ত যাবেন, অতঃপর পেছনের দিক থেকে সামনের দিক পর্যন্ত একইরকম মুছে আসবেন। হাতের তালুর ভেতরের অংশ দিয়ে মাথার দুই পাশেও মাসেহ করতে হবে। এভাবে পুরো মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর বিবরণ দিতে গিয়ে নিজে উযূ করে দেখিয়েছেন। উক্ত হাদীসে এসেছে,

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ؛ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

-তারপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে ও পিছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন।[২৭]

১১. উভয় কান মাসেহ করা

উযূতে মাথা মাসেহ করার পর উভয় কান মাসহ করা সুন্নাত। কান মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং মাথা মাসেহ করার পর ভেজা হাত দিয়েই কান মাসহ করা হবে। এক্ষেত্রে উভয় হাতের বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী আঙুল ব্যবহার করতে হয়। উভয় কানের ভিতরের ও বাহিরের অংশ মাসহ করা সুন্নাত। আবূ দাউদ (র.) বর্ণিত হাদীসে উসমান (রা.) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর বিবরণে এসেছে:

فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً

-পরে তিনি পানি তুলে নিয়ে মাথা ও কান মাসেহ করলেন এবং কানের ভিতর ও বহিরাংশ একবার করে মাসহ করলেন।[২৮]

১২. উযূর আয়াতে বর্ণিত অঙ্গসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

উযূর আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই ধারাবাহিকতা অনুসারে উযূ করা সুন্নাত। অর্থাৎ প্রথমে উভয় হাত ধোয়া, অতঃপর মুখ ধোয়া, অতঃপর মাথা মাসেহ করা এবং সবশেষে উভয় পা ধোয়া। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রথমে কুলি করা ও পরে নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত। উযূর অঙ্গসমূহ ধোয়ার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করাও সুন্নাত। অর্থাৎ হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত ধোয়া এবং পা ধোয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা ধোয়া। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

-নবী ﷺ জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালোবাসতেন।[২৯]

আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

-যখন তোমরা কিছু পরিধান করবে এবং উযূ করবে, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।[৩০]

১৩. অঙ্গসমূহ ধোয়া ও মাসেহ করার মধ্যখানে বিরতি না দেওয়া

এক অঙ্গ ধোয়ার পরপরই অন্য অঙ্গ ধোয়া এবং কোনো উযর ব্যতীত মধ্যখানে বিরতি না দেওয়া সুন্নাত, এমন বিরতি, যাতে পরের অঙ্গ ধোয়ার আগেই পূর্বের ধোয়া অঙ্গ শুকিয়ে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সবসময় এভাবেই উযূ করতেন।[৩১]

১৪. ধোয়ার অঙ্গসমূহ ঘষে ঘষে ধোয়া

উযূতে যেসকল অঙ্গ ধোয়ার বিধান রয়েছে, সেগুলো ভালো করে ঘষে ঘষে ধোয়া সুন্নাত। যাতে চামড়ার প্রতিটি লোমকূপে সুন্দরভাবে পানি পৌঁছে যায়। এটা সুন্নাত হওয়ার কারণ হলো এর মাধ্যমে ফরয পূর্ণ হয়। আর যে কাজের মাধ্যমে ফরয পূর্ণতা লাভ করে, তা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.

-নবী ﷺ-এর কাছে দুই-তৃতীয়াংশ মুদ (পরিমাণে সামান্য) পানি আনা হয়েছিল এবং তিনি তা দিয়ে উযূ করেছিলেন। তিনি তার বাহু দুটো ভালোভাবে ঘষে নিলেন।[৩২]

কুদুরী গ্রন্থ প্রণেতা নিয়ত, তারতীব (উযূর অঙ্গসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা) এবং মাসহের ক্ষেত্রে পুরো মাথা পরিব্যাপ্ত করে নেওয়াকে উযূর মুস্তাহাব কাজসমূহের মধ্যে শামিল করেছেন। তবে হিদায়া, মুহিত, তুহফাহ, ইদাহ, ওয়াফী ইত্যাদি গ্রন্থে উপর্যুক্ত কাজসমূহকে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই বিশুদ্ধতম মত।[৩৩]

উযূ যথাযথভাবে আদায় করে সালাত আদায় করা মুসলিমদের কর্তব্য। উযূ আদায় না হলে সালাত হবে না। পূর্ণাঙ্গভাবে উযূ আদায়ের জন্য এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত আমলসমূহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

১. সূরা নাজম: ৩-৪; ২. ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৮; আল ফিকহুল হানাফী ফি সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ৭২; ৩. সহীহ বুখারী (০১);
৪. তাবারানী, আল মুজামুস সগীর (১৯৬); মাজমাউয যাওয়াইদ (১১১২)। নূরুদ্দীন হাইসামী বলেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান। মুসনাদু আহমাদ (৯৪১৮)-এর টীকায় শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল। তিনি বেশ কয়েকটি হাদীসগ্রন্থ থেকে এর তাখরিজ করেছেন। অবশেষে মন্তব্য করেছেন, এটি স্পষ্ট যে, হাদীসটির বিভিন্ন সনদের সম্মিলিত রূপ থেকে এমন শক্তি প্রকাশ পায়, যা প্রমাণ করে যে, এর একটি মূল ভিত্তি রয়েছে -দ্রষ্টব্য: মুসনাদু আহমাদ, খ. ১৫, পৃ. ২৪৪-২৪৫;
৫. সহীহ মুসলিম (২৭৮); আবূ দাউদ (১০৩); মুসনাদু আহমাদ (১০০৯১)। হাদীসটি বুখারী (১৬২), তিরমিযী (২৪), নাসাঈ "আস সুনানুল কুবরা" (২০৪)-তে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে কিছু বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে "তিনবার" কথাটি উল্লেখ করেননি।
৬. সহীহ মুসলিম (২৭৮); আবূ দাউদ (১০৩); মুসনাদু আহমাদ (১০০৯১)। হাদীসটি বুখারী (১৬২), তিরমিযী (২৪), নাসাঈ "আস সুনানুল কুবরা" (২০৪)-তে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে কিছু বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে "তিনবার" কথাটি উল্লেখ করেননি।
৭. ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ২১; ৮. সহীহ মুসলিম (২২৬)।
৯. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৭।
১০. আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৪৫; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৭।
১১. দুরারুল হুক্কাম, খ. ১, পৃ. ১১; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৭; আল বাহরুর রাইক, খ. ১, পৃ. ২১।
১২. সহীহ বুখারী (৮৮৭); সহীহ মুসলিম (২৫২)।
১৩. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৬।
১৪. সহীহ মুসলিম (২২৬)।
১৫. ফাতহু বাবিল ইনায়া বিশারহিন নিকায়া, খ. ১, পৃ. ৫০; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৬।
১৬. সহীহ বুখারী (১৬১); সহীহ মুসলিম (২৩৭)।
১৭. আবূ দাউদ (১৩৯); বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা (২৩৪)। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল।
১৮. বাদাইউস সানাঈ, খ. ১, পৃ. ২১; আল ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ৭৫।
১৯. তিরমিযী (৩১), সনদ হাসান সহীহ।
২০. তিরমিযী (৩৮, ৩৯), সনদ সহীহ।
২১. সহীহ বুখারী (১৫৯); ২২. তিরমিযী (৪৪), সনদ সহীহ।
২৩. তিরমিযী (৪৪); ২৪. সহীহ বুখারী (১৫৯)।
২৫. আবূ দাউদ (১১৫)। হাদীসটির সনদ সহীহ -শুআইব আরনাউত; ২৬. বাদাইউস সানাঈ, খ. ১, পৃ. ২২।
২৭. সহীহ বুখারী (১৮৫)।
২৮. আবূ দাউদ (১০৮); মুসনাদু আহমাদ (৮৬৫২)। হাদীসটির সনদ সহীহ -শুআইব আরনাউত।
২৯. সহীহ বুখারী (১৬৮)।
৩০. আবূ দাউদ (৪১৪১)। হাদীসটির সনদ সহীহ -শুআইব আরনাউত।
৩১. আল ফিকহুল হানাফী ফি সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ৭৯।
৩২. সহীহ ইবন খুযাইমা (১১৮); সহীহ ইবন হিব্বান (৬০৭৭)।
৩৩. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৮।

শিশুর বেড়ে ওঠার সময়
লালন-পালন ও তারবিয়াত

মূল: হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল গাযালী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ: ইমাদ উদ্দীন তালুকদার

[সন্তান হচ্ছে পিতা-মাতার নিকট আমানত, এজন্য সন্তান-সন্ততিকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে বড় করে তোলা পিতা-মাতার দায়িত্ব। কেননা সন্তান পিতা-মাতার পরকালীন নাজাতের ওয়াসীলা হতে পারে। শিশুর বেড়ে ওঠার সময় লালন-পালন ও তারবিয়াত এর প্রয়োজনীয়তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা গত সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। এ সংখ্যায় প্রবন্ধটির শেষ পর্ব প্রকাশিত হলো।-সম্পাদক]

সন্তানকে বিনয় ও অর্থবিত্তের সংযম শিক্ষা দেওয়া

সন্তানকে তার সহপাঠীর সাথে পিতা-মাতার সম্পদ, আভিজাত্য, খাবার, কাপড় ইত্যাদি নিয়ে গর্ব করতে নিষেধ করবেন এবং শিখিয়ে দেবেন তাদের সাথে কথা বলার সময় যেন জীবনে প্রাপ্ত নিআমতরাজির ব্যাপারে বিনয়, দয়াপ্রবণ, সম্মানপ্রদর্শন করে। শিশুকে অন্য কারোর থেকে কিছু গ্রহণ করতে নিষেধ করবেন হউক প্রভাবশালী কারোর সন্তান। বরং তাকে শিক্ষা দিবেন– মর্যাদা হলো অন্যকে দেওয়ার মাঝে, নেওয়ার মাঝে মর্যাদা নেই। কারো থেকে নেওয়া হলো, নীচতা, হীনতা এবং তাচ্ছিল্যতা। আর যদি সে গরিব সন্তান হয় তখনও তাকে শিক্ষা দিবেন কারো থেকে নেওয়া ও পাওয়ার লোভ অপমানের। এই অন্যের কাছ থেকে নেওয়ার আদত হল ইতর প্রাণী কুকুরের ন্যায় উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য লোভাতুর দৃষ্টির অপেক্ষার মত। মোদ্দাকথা হলো, বালক সন্তানের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য, লোভ-লালসার প্রতি আসক্তিকে মন্দ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। এই দুই বিলাসী অলংকারকে কঠিন মুসীবত মনে করে বেশি গুরুত্বের সাথে সাবধান করা বিষয়ের মত সতর্ক করতে হবে। কেননা স্বর্ণালংকার, বিভিন্ন বিষয়ের প্রবৃত্তির লালসার বিপদ বালক সন্তানের জন্য খুবই ভয়ংকর। এই আসক্তির ভয়ংকর দিক কেবল শিশু কিশোরদের নয় বরং বেশিরভাগ বড়দের ক্ষেত্রেও তার ক্ষতিকর দিকের প্রভাব দেখা যায়।

মজলিসের শিষ্টাচার শেখানো

শিশু সন্তানকে অন্যান্য আদব শিক্ষা দিতে হবে। যেমন, মজলিসের ক্ষেত্রে মজলিসে বা কারোর সামনে থুথু না ফেলা, নাসিকা না ঝারা, হাই না তোলা, বসার সময় মানুষকে পেছন না দিয়ে বসা, পায়ের উপর পা না তোলা, হাতের উপর থুতনি বা গাল ভর না দেওয়া, মাথা বাহুতে ভর না দেওয়া। এই অভ্যাসগুলো অলসতার আলামত বহন করে, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। এভাবে সুন্দর করে সন্তানকে বসার নিয়ম শিক্ষা দিবেন। বাচালতা থেকে দূরে থাকতে বলবেন। তাকে বুঝাবেন এটা হচ্ছে নির্লজ্জতা, বেয়াদবির লক্ষণ এবং দুষ্টু বালকের কাজ।

কথাবার্তার আদব শেখানো

তাকে কথায় কথায় কসম করতে না করবেন, সত্য-মিথ্যা উভয় ক্ষেত্রেই। কারণ এতে করে সে ছোটবেলা থেকেই কসম করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সন্তানকে বড়দের সাথে আগ বাড়িয়ে গল্প শুরু করতে নিষেধ করবেন এবং তাকে প্রয়োজন পরিমাণ প্রশ্নের জবাব দিতে শিক্ষা দিবেন। তাদের সাথে কথা বলার সময় এবং অন্যান্য বড়রা কথা বলার সময় মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য বলবেন। বড়দেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেওয়া, তাদের বসার উত্তম ব্যবস্থা করা এবং তাদের সামনে না বসার জন্য বলবেন। শিশুকে কথাবার্তায় অনর্থক, অশ্লীল কথা ও অভিশাপ, গালাগাল, তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলবে। সাথে এই মন্দ আচরণের কোনো একটিতেও অভ্যস্ত কারোর সঙ্গ না নিতে বলবেন। কারণ এমন মন্দ অভ্যাস খারাপ সঙ্গীদের কারণেই হয়ে থাকে। আর এটা মূল কথা যে, শিশু কিশোরের চরিত্র হিফাযতের মূলই হল অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা।

শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি

শিশুর উচিত হল শিক্ষক শাসন করলে চিৎকার করে ক্রন্দন না করা, গোলযোগ না করা। উচিত নয় শাস্তির ক্ষেত্রে অন্যের সুপারিশ লাগানো বরং এতে ধৈর্য্য ধরবে। সন্তানকে শিক্ষা দিবেন– শিক্ষকের শাসন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে সবর করা হলো বীরত্ব ও গুণী ব্যক্তিবর্গের অভ্যাস আর চিৎকার করে কান্নাকাটি করা দাসদাসী ও মহিলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নিয়ম হলো, পড়ালেখার সময়ের পর কিছু সময় সন্তানকে উত্তম খেলাধুলার অনুমতি দেওয়া। শিশুরা খেলাধুলায় সাধারণত ক্লান্ত না হওয়ায় খেলাধুলা তাদের জন্য পড়ালেখার চাপের মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার মত হবে। এই সুযোগ না দিয়ে কেবল পড়ালেখার চাপে রাখলে এই রুটিনে শিশুর মনের চাঞ্চল্যতা মরে যায়, বুদ্ধিমত্তা নষ্ট হয় এবং জীবনকে স্বাদহীন বানিয়ে দেয়। এভাবে সে একসময় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে পালানোর বাহানা তালাশ করবে। সন্তানকে পিতামাতা, শিক্ষক কিংবা আত্মীয়-অনাত্মীয় বড়দের আনুগত্য করার শিক্ষা দিবেন। সে যেন তাদের প্রতি সম্মানের সাথে আচরণ করে, তাদের সামনে খেলাধুলায় মেতে না ওঠে।

ভালোমন্দ অনুধাবন করতে পারার বয়স হলে করণীয়

সন্তান যখন ভালোমন্দ চেনার বয়সে উপনীত হবে তথা বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়স হয়ে যাবে, তখন তাকে পবিত্রতা অর্জন ও নামাযের ব্যাপারে যেন ছাড় দেওয়া না হয়। এ সময় তাকে মাঝে মাঝে রোযা রাখার আদেশ দিবেন। পাশাপাশি তাকে রেশমী কাপড়, স্বর্ণালংকারসহ শরীআতে যা নিষেধ এবং যে ক্ষেত্রে হদ তথা দুনিয়াতেই শাস্তি দেওয়া হয় এমন বিষয়ে তাকে তখন ছাড় দেওয়া যাবে না। সন্তানকে চুরি, হারাম ভক্ষণ, মিথ্যা কথা, খিয়ানত, ধোঁকাবাজিসহ আরও অন্যান্য গুনাহের কাজ যা করার ক্ষেত্রে শিশুরা সাধারণত আগ্রহী হয়ে উঠে, সেগুলির ব্যাপারেও তাকে ভয় দেখিয়ে রাখবেন যাতে সেসব কাজ সে না করে। আর যখন তারা শিশুকাল পার হওয়ার বয়সে উপনীত হবে, তখন সে এই কার্যাদির ক্ষেত্রে আলোচিত নির্দেশনার মূল আবেদন অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। এই সময়ে তাকে বলবে, খাওয়া তো ঔষধ আর খাদ্য গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরকে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য

কিছুরই মৌলিক অস্তিত্ব নেই। কারণ তা চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যু এই জগতের সাথে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাবে। এই দুনিয়া হচ্ছে সফরের স্থান; চিরস্থায়ী অবস্থানের জায়গা নয়। মৃত্যু প্রতিটা সময় অপেক্ষা করছে। মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তির মাঝে সেই জ্ঞানী, যে দুনিয়াতেই আখিরাতের পাথেয় প্রস্তুত রাখে। এভাবে দুনিয়াকে আখিরাতের সেতুবন্ধন মনে করে প্রতিটা সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিতে কাজে লাগানো ব্যক্তির আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, দুনিয়া আখিরাত তার জন্য প্রশস্ত করা হয়। ছোটবেলায় যখন তার লালন-পালন এমন উত্তম তারবিয়াতের উপর হবে, যৌবনকালে তার বাস্তবতার প্রভাব পাথরে খোদাই করার মতো স্থায়িত্ব সম্পন্ন পাওয়া যাবে। আর যদি সন্তানের বেড়ে উঠার সময় এই নির্দেশনার বিপরীত প্রতিপালন করা হয়, তাহলে সে খেলতামাশাকারী, অশালীন, লজ্জাহীন, নিষিদ্ধ খাবারে ভোজনরসিক, রং-ঢং কাপড় পরিধানকারী, সৌন্দর্যে আসক্ত, অহংকারী হয়ে উঠবে। তার লালনপালনে গুরুত্ব না দিলে একসময় সে আর সদুপদেশ ধারণ করতে পারবে না, যেভাবে ধুলাবালি দেয়ালে আটকে না থেকে ঝরে পরে। তাই সবার আগে শিশুর ক্ষেত্রে করণীয় হল তাকে উত্তম তারবিয়তের সাথে লালনপালন করার উপর গুরুত্বারোপ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাত তথা স্বাভাবিক ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় অথবা খ্রিষ্টান বানায় কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।[১]

যিকর, তাসবীহ ও বিলাসিতা বর্জনের শিক্ষা দেওয়া

হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারী রাহিমাহুল্লাহ (২৮৩ হি.) বলেন, আমি ছিলাম তিন বছর বয়সি সন্তান। আমি রাতে জাগ্রত হয়ে আমার খালু মুহাম্মাদ বিন সাউয়ার বসরী রাহিমাহুল্লাহর নামায অবলোকন করতাম। একদিন, তিনি আমাকে বললেন, তুমি কেন তোমার আল্লাহকে স্মরণ কর না, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? আমি বললাম, কীভাবে আমি আল্লাহকে স্মরণ করতে পারি? তিনি বলেন, তুমি রাতে শয্যায় গমনকালে তোমার অন্তর থেকে কাপড় পরিবর্তন করার সময় তোমার জিহ্বা না নাড়িয়েই ৩ বার বলবে,

اللهُ مَعِي (আল্লাহর কর্তৃত্ব আমার একান্ত নৈকট্যে)

اللهُ نَاظِرٌ إِلَيَّ (আল্লাহ আমার অবলোকনকারী)

اللهُ شَاهِدِي (আল্লাহ আমার সাক্ষী)

আমি কয়েক রাত তা কিছুদিন আমল করলাম। তিনি আবার আমাকে বলেন, এখন তুমি প্রতিদিন ৭ বার এই তাসবীহ পড়বে। এভাবে কয়েকদিন আমল করার পর আমার অবস্থা জানালাম। তিনি বললেন, এই তাসবীহ ১১ বার করে পড়বে। আমি তা আমল করলাম। এভাবে আমার অন্তরে এই তাসবীহের স্বাদ অনুভব করতে লাগলাম। এভাবে আমল করার একবছর অতিবাহিত করার পর আমার খালু মুহাম্মাদ বিন সাউয়ার রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বলেন, "আমি যা শিক্ষা দিলাম তা তুমি যত্ন করে হিফাযত করবে এবং এই আমল নিয়েই যেন কবর পর্যন্ত গমন কর অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই এই আমল করবে। কারণ এই আমল তোমাকে দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতে সাহায্য করবে।" আমি এই আমল অনেক বছর ধরে করতে থাকি এবং আমার মনের মাঝে আলাদা প্রশান্তি অনুভব করি। অতঃপর একদিন আমার খালু আমাকে বললেন, 'হে সাহল! যার নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর কাছে, যার সবকিছু আল্লাহ অবলোকন করেন এবং আল্লাহ যার সবকিছুর সাক্ষী– সে কি আল্লাহর অবাধ্যতা করে? তোমার উচিত সমস্ত গুনাহ থেকে দূরে থাকা। এরপর থেকে আমি একা থাকতে লাগলাম। আমার অভিভাবকরা আমাকে প্রথম বিদ্যালয়ে পাঠালে আমি আল্লাহর যিকর থেকে আলগা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি। তখন তারা আমার জন্য দিনের কিছু সময় উস্তাযের নিকট পড়ে আসার জন্য নির্ধারণ করেন। এভাবে পড়ে ফিরে আসি। আমি এভাবে কিতাবে সময় কাটালাম এবং আমি পবিত্র কুরআন শরীফ হিফয করে ফেললাম যখন আমার বয়স ৬/৭ হবে। আমি ১২ বছর বয়স থেকেই বছরজুড়ে রোযা রাখা শুরু করি। তখন আমার খাদ্যশক্তি ছিল যবের রুটি। ১৩ বছর বয়সে আমার মনে প্রশ্ন জাগ্রত হলে আমি আমার পরিবারকে বলি আমাকে বসরা শহরে পাঠিয়ে দিতে। বসরার আলিমগণকে আমার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। তাদের নিকট সন্তোষজনক জবাব পেলাম না। পরবর্তীতে আমি আবাদান শহরের শাইখ হাবীব হামযাহ বিন আবী আব্দিল্লাহ আব্বাদানীর নিকট গেলাম, যিনি আমার পিতার পরিচিত ছিলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলে তাঁর নিকট সন্তোষজনক জবাব পাই। আমি তাঁর সুহবতে দীর্ঘদিন কাটাই। আমি শাইখের নসীহতমূলক কথাবার্তায় উপকৃত হই। তাঁর আদব থেকে আমি আদব শিক্ষা লাভ করি। এরপর আমি আমার শহর তুসতারে ফিরে আসি। তুসতারে আমি জীবিকা নির্বাহের কাজে লাগলাম এই শর্তে যে, আমার জন্য যেন খাবার হিসেবে এক দিরহাম দিয়ে ফারাক (এলাকা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাপের পরিমাণ) যব কিনে তা চূর্ণ করে রুটি বানানো হয়। আমি তা দিয়ে রাতে প্রত্যেক দিন এক উকিয়া (এলাকা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাপের পরিমাণ) কেবল সাহরীর সময় খেতাম। রুটির সাথে লবণ ও কোনো ধরনের তরকারি, মসলা ছাড়াই খেতাম। এই এক দিরহাম পরিমাণ যব আমার এক বছরের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। এভাবে খাওয়ার পর আমি মনস্থির করলাম টানা তিন দিন রোযা রাখার এবং পরবর্তীতে একরাত রোযা ভাঙতাম। এভাবে পরবর্তীতে বাড়িয়ে পাঁচদিন, তারপর সাতদিন করে করে পঁচিশদিন পর্যন্ত টানা রোযা রেখে তারপর একদিন খাবার খেতাম। এভাবে বিশ বছর অতিবাহিত করলাম। এরপর আমি বের হয়ে অনেকদিন সফরে কাটালাম। সফর শেষ করে তুসতারে এসে নামায আদায়ের মধ্যদিয়ে সারা রাত পার করতে লাগলাম। আহমদ বলেন, আমি সাহল তুসতারী রাহিমাহুল্লাহকে মৃত্যু পর্যন্ত লবণ খেতে দেখি নাই।[২]

সুত্রঃ

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ'র কালজয়ী 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবের 'রুবউল আদাত' অধ্যায়ের 'রিয়াদাতুন নাফস ওয়া তাহযীবুল আখলাক' পরিচ্ছেদের 'বাইয়ানুত তারিক ফী রিয়াদাতিস সিবইয়ান ফী আউয়ালি নাশওয়িহিম ওয়া ওয়াজহু তাদীবিহিম ওয়া তাহসীনি আখলাকিহিম' পাঠের অনুবাদ।

---

[১] ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী: ১৩১৯

[২] রিসালাতুল কুশাইরিয়া: ১/৫৯-৬১ (মাকতাবাতুশ শামিলা)

রঙ হোক আপনাদের
ভালোবাসার, ভালো লাগার
মুদ্রণ ও শৈল্পিক কাজের
শিল্পবন্ধু

রঙ প্রিন্টার্স
সৃষ্টিতে শৈল্পিক কারুকাজ

০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
০১৭৬৪ ০৩৬২৯০

rangprinter@gmail.com
rangprintersbd@gmail.com

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা)
বন্দরবাজার, সিলেট



অসমাপ্ত বিপ্লব : শাম এর ভবিষ্যত

মুহাম্মাদ বিন নূর

মুসলিম পাঠকদের নিকট শাম দেশ বহুল পরিচিত নানা কারণে। রাসূলে খোদার বিশেষ দুআ থেকে শুরু করে ইসলামের ইতিহাসে হাজারো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কেন্দ্রভূমি এই শাম দেশকে না চেনা কোন কারণ নেই। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের আঁকা মানচিত্রের কল্যাণে সেই ঐতিহাসিক শাম দেশ আজ বহুখণ্ডে বিভক্ত; সিরিয়া, লেবানন, অখণ্ড ফিলিস্তিনের সবটুকু অঞ্চল ছাড়াও আরো বেশ কয়টি দেশের অংশ জুড়ে ঐতিহাসিক শাম দেশের বিস্তৃতি।

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন গত বছর অক্টোবর থেকে বলতে গেলে পুরো বিশ্বরাজনীতির অন্যতম প্রভাবকের ভূমিকায় এই শাম দেশ, তবে সেটার কেন্দ্রে মূলত ছিল অখণ্ড ফিলিস্তিনি অঞ্চল। বলতে গেলে আকস্মিক সকলের সেই দৃষ্টি ঘুরে এসে পড়ে আধুনিক সিরিয়া নামক রাষ্ট্রের দিকে। সিরিয়ায় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই ২০১১ সালে, ক্রমে সেটি রূপ নিয়েছিল গৃহযুদ্ধে। সে সময়কার বিশ্বরাজনীতির খোঁজ রাখলে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে সিরিয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল সকলের চোখে। কিন্তু রাশিয়া ও ইরানের নিঃশর্ত সমর্থন, আমেরিকার আগ্রহের ঘাটতি আর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল সব হিসেবে-নিকেশের ফাঁক গলে আসাদ শাহীর মসনদ টিকে যায় লম্বা সময় ধরে। ক্রমে সকলে আশা হারাতে বসেন, এক সময়ের আসাদ শাহীর কড়া সমালোচক আরব দেশগুলোও আবার তার সাথে হাত মেলাতে চায়, আরবলীগে ফিরে আসে আসাদের সিরিয়া, কট্টর পশ্চিমা মিত্র আমিরাতও আসাদ শাহীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে মনযোগ দেয়। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে যে তার এমন পতন হবে, সেটা আমাদের মতো আন্তর্জাতিক রাজনীতির লেখকদের কথা বাদ দিন, এই অঞ্চলের জাঁদরেল সব কূটনীতিবিদরাও বুঝতে পারেননি, পারলে নিশ্চয়ই আসাদের চরম শত্রু আরব দেশগুলো সব ভুলে আবার হাত মেলাতে এগিয়ে আসতো না। কী ঘটেছে তাহলে, সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে প্রথমে সিরিয়াতে আন্তর্জাতিক পক্ষসমূহের খোঁজখবর নেওয়াটা জরুরি।

সিরিয়ার আসাদ পরিবার মূলত সংখ্যালঘু নুসাইরি সম্প্রদায়ের। যারা মূলধারার শীআ না হলেও শীআদের মিত্র। সেই সুবাদে আসাদ শাহী ইরানের মিত্র, অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুশমন আর প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ানদের প্রিয়পাত্র। একই সূত্র ধরে তুর্কি এবং আরব দেশগুলো আবার স্বভাবতই আসাদ শাহীর দুশমন। সিরিয়ায় বিপ্লবের সূচনালগ্নে এই ছিল মোটামুটি সার্বিক পরিস্থিতি। পরবর্তীতে কাতার এবং তুর্কি ইরানের সাথে বিভিন্ন সময় ঘনিষ্ট হলেও সিরিয়ায় আসাদবিরোধীই থেকে যায়। আবার দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা এই গৃহযুদ্ধের একটা পর্যায়ে সৌদি-আমিরাতের মতো আরব দেশগুলো এবং তাদের প্রভু মার্কিনিরা সিরিয়া থেকে খানিকটা মুখ ফিরিয়ে নেয় বলা চলে। সৌদি-আমিরাত ইরানের সাথে খুব একটা ঘনিষ্ঠ না হলেও আসাদ শাহীর ঘনিষ্ঠ হতে থাকে কিছুটা, সেই সুবাদে মার্কিন চাপও কমতে থাকে আসাদের উপর। কিন্তু রাশিয়া-ইরান আসাদের পক্ষে আথ তুর্কি বিদ্রোহীদের পক্ষে সক্রিয়তা একটুও কমায়নি। ইরানের জন্য আসাদ শাহীকে দরকার নিজের প্রক্সি হিসেবে, আবার আরেক প্রক্সি হিযবুল্লাহর অস্ত্র সরবরাহের রাস্তা পরিষ্কার রাখার জন্যে। অন্যদিকে তুর্কি কুর্দি ইস্যুতে নিশ্চিন্ত থাকতে নিজের পছন্দের শাসক চায় সিরিয়ায়।

আসাদ শাহীর চরম যুলমের রাজত্ব সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বে তাদের একটা ইতিবাচক পরিচয় ছিল- তারা হামাসের সহযোগী। সেই পরিচয়ের ইতি ঘটে সিরিয়ায় সুন্নীদের উপর হামলার বিরোধিতা করে হামাস তাদের শক্তিমান মিত্র ইরানের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও সিরিয়া থেকে নিজেদের কার্যক্রম সরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে; সাত অক্টোবরের তুফান শুরু হলে ততদিনে আসাদ শাহী আবার আমিরাতের সাথে খানিকটা সখ্য গড়ে তোলার সুবাদে মূলত আমিরাতের সুপারিশে আসাদের সিরিয়া হামাসের পক্ষে সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। শাম অঞ্চলে ইরানের প্রক্সি বা মিত্রদের মধ্যে একমাত্র সিরিয়াই একটা গুলিও ছুড়েনি জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে। ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ অক্ষে সিরিয়ার একমাত্র কার্যকরিতা ছিল হিযবুল্লাহর অস্ত্র সরবরাহের রুট হিসেবে, এর বাইরে অন্যসব আরব রাষ্ট্রের মতোই হাত গুটিয়ে বসে ছিল আসাদ শাহী।

তবু এই প্রতিরোধযুদ্ধই কাল হলো আসাদ শাহীর জন্যে। এর আগে মার্কিন বা তুর্কি মদদপুষ্ট বিপ্লবীদের হাত থেকে আসাদ শাহীকে রক্ষা করেছে মূলত ইরানের প্রক্সি হিযবুল্লাহর স্থলযোদ্ধা (যারা সিরিয়ায় সুন্নীদের উপর অবর্ণনীয় নৃশংসতা চালিয়েছে আসাদকে বাঁচাতে) আর রাশিয়ার আকাশযোদ্ধারা। এই মুহূর্তে ইসরায়েলি দখলদারদের সাথে যুদ্ধ করে বিপর্যস্ত হিযবুল্লাহ, অন্যদিকে ইউক্রেনে মহাব্যস্ত রাশিয়া। আসাদবাহিনী ভিতরে থেকে এতোটাই ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল যে এমন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীদের ধাক্কা সামলানো দূরে থাক, বিদ্রোহীদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। অভাবনীয় কম রক্তপাতে পতন ঘটেছে দামেশকের আসাদবাহিনীর, আসাদ নিজে পালিয়ে গেছেন বিশ্বস্ত মিত্রদেশ রাশিয়ায়। অবশ্য কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা, রাশিয়াই ইউক্রেনের বিনিময়ে আসাদকে বিসর্জন দিয়েছে। আসাদের পতনের পূর্ব মুহূর্তে কাতারে রাশিয়া-ইরান-তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকের পরপর এমন পলায়ন দেখে অনেকের সন্দেহ এই বৈঠকেই হয়তো বিসর্জনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছিল।

আসাদের পতনের পর সিরিয়াতে মূলত তিনটি পক্ষের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে আছে হাইআতু তাহরীর আশ-শাম, এরা এককালে আল কায়েদা ও আইসিসের সাথে থাকলেও পরবর্তীতে সেসব সম্পর্ক ছিন্ন করে গড়ে তুলেছে এই সংগঠন। আদর্শের দিক থেকে ইসলামপন্থার কথা বললেও তারা আল কায়েদার মতো বৈশ্বিক বিপ্লবের স্বপ্ন ছেড়ে তালেবানের মতো স্বদেশের গণ্ডিতে ইসলাম কায়িমের কথা বলে, যদিও তাদের প্রধান নেতা আবু মুহাম্মাদ আল জুলানী নিজে সিরিয়ার ভূমিপুত্র নন। তুর্কি কিংবা পশ্চিমারা এদের প্রতি সরাসরি সমর্থন না

দিলেও বেশ খানিকটা প্রশ্রয় যে দিয়েছে বা দিচ্ছে, তা এতদিনে সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় দল হলো ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, এরা মূলত সিরিয়ান জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং তুর্কি এদের প্রত্যক্ষ সমর্থক। তৃতীয় দল হলো কুর্দিরা, তুর্কির মূল মাথা ব্যথা এদের নিয়ে; কারণ এই দল যত শক্তিশালী হবে তুর্কির আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ঝুঁকি তত বাড়বে। আসাদ শাহীর পতনপরবর্তী বাস্তবতা হলো- আবু মুহাম্মাদ আল জুলানীই কার্যত সিরিয়া শাসন করছেন, তার ঘনিষ্ঠজনকে আন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন, দামেশকে অন্য দুই পক্ষকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না বলা চলে।

আসাদ শাহীর পতন সিরিয়ার মযলুম জনতার জন্যে নিঃসন্দেহে পরম স্বস্তি এনে দিয়েছে। পলায়নের খবর নিশ্চিত হতে না হতে প্রতিবেশী দেশসমূহে আশ্রিত শরণার্থীরা দলে দলে প্রত্যাবর্তন শুরু করেছেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সিরিয়ার ভিতরে থাকা নাগরিকগণও। বিজয়ের উৎসবে মেতে উঠেছেন তারা। আসাদ ও তার মিত্র বাহিনীরা এতো বছর ধরে যে নৃশংসতা চালিয়েছিল তাদের উপর, সেই প্রেক্ষাপটে তাদের এই বিজয়োল্লাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার নৈতিক অধিকার কারোরই নেই। তবু এই বিপ্লবের ভাগ্য নিয়ে জমে আছে অনেকগুলো প্রশ্নের মেঘ। আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারদের পতনের পর সেখানে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তালেবানের হাতে থাকায় পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণ যতটা সহজ হয়েছিল, সিরিয়ায় তিনটি ভিন্ন আদর্শের সশস্ত্র গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে সেটা ততটা সহজ নাও হতে পারে। তদুপরি নিকট প্রতিবেশী তুর্কির নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং দূর প্রতিবেশী ইরানের এই অঞ্চলের প্রক্সিদের স্বার্থে সিরিয়ার দিকে যা নযর থাকবে, তাও সিরীয় জনগণের ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে হচ্ছে।

তদুপরি শাম দেশে আমাদের একমাত্র উদ্বেগ সিরিয়াকে নিয়ে নয়, ফিলিস্তিন আমাদের অন্যতম উদ্বেগের জায়গা। শামের আরেক দেশ লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিযবুল্লাহ সিরিয়ায় নিরীহ জনগণের উপর নৃশংসতার খলনায়কের ভূমিকায় থাকলেও ফিলিস্তিনে তাদের অবস্থান মযলুমের পক্ষে। ফলে সিরিয়ায় তাদের শক্তিমত্তায় ধ্বস নামাটা স্বস্তির হলেও ফিলিস্তিনের মযলুমদের জন্য সেটা খানিকটা হলেও ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইরানীদের দাবি ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ অক্ষকে দূর্বল করতে ইসরায়েল ও আমেরিকা মিলে আসাদ শাহীকে তাড়িয়েছে। সে দাবির সত্যতা যাচাই না করেও বলা যায়, এরই মধ্যে জুলানী ঘোষণা দিয়েছেন- সিরিয়া ফিলিস্তিনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না, তারা নিশ্চয়ই নিজেদের চরম শত্রু হিযবুল্লাহর অস্ত্রের রুট হিসেবেও সিরিয়ার মাটিকে ব্যবহৃত হতে দিবেন না। ফিলিস্তিনের যুদ্ধে না জড়ানোর ঘোষণা সত্ত্বেও ইসরায়েল সব ধরনের চুক্তি ভঙ্গ করে এই কয়দিনে সিরিয়ায় যা হামলা করেছে, তাতে সিরিয়ার জন্যে ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস করার কোন কারণও নেই। তদুপরি আল জুলানী ও তার দলের বিরুদ্ধে আইসিস-আল কায়েদা সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পিছনে ফেলে সিরিয়া রাষ্ট্রকে দাঁড় করানোর স্বার্থে পশ্চিমা সহযোগিতা নিতে হলেও তাকে ফিলিস্তিনের বিষয়ে চোখ বুজে থাকতে হবে। অন্যথায় পশ্চিমা অবরোধ আর ইসরায়েলি হামলার মুখে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার জন্য টিকে থাকাই হয়তো মুশকিল হবে এই মুহূর্তে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের আঁকা মানচিত্রের বদৌলতে আজকের দুনিয়ায় সিরিয়ার স্বার্থ আর ফিলিস্তিনের স্বার্থকে আলাদা করেই দেখতে হচ্ছে, চরম দুঃখজনক হলেও এই বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আসলে নেই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আসাদ শাহীও আসলে খুব একটা ফিলিস্তিনের পক্ষে সক্রিয় ছিল না, এই দিক থেকে ইসরায়েল মোটামুটি নিশ্চিন্তই ছিল। বর্তমান সিরিয়াকে নিয়ে বরং ইসরায়েলের যথেষ্ট দুশ্চিন্তা-- কারণ এই জনগণ তো আসলে ফিলিস্তিনের পক্ষের। ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিকদের মতে সিরিয়া এখন ইসরায়েলের হাতের মুঠোয় হলেও ইসরায়েল নিজে ততটা নিশ্চিত নয় এই বিষয়ে। তবে আপাতত ফিলিস্তিনের পক্ষের প্রতিরোধ অক্ষে যে সিরিয়ার উপস্থিতি থাকছে না, তা নিশ্চিতই বলা চলে।

এই পরিস্থিতিতে আসাদের পতনে সিরিয়াবাসীর বিজয় হয়েছে বললেও তাদের এই বিপ্লবকে অসমাপ্ত বিপ্লবই বলতে হচ্ছে। সিরিয়ার স্থিতিশীলতা এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা যেদিন অর্জিত হবে, সেদিনই আমরা শামদেশের বিপ্লবের সাফল্য ও বিজয় উদযাপন করবো, আপাতত সেই বিজয়ের প্রতীক্ষা আর প্রার্থনাই করতে হয়। রাসূলে আকরাম ﷺ শামদেশে বরকতের দুআ করেছেন, আমরাও ফিলিস্তিন-সিরিয়া-লেবাননসহ পুরো শামের বরকতের দুআ করি, নবীজির সেই দুআর বরকতে শামজুড়ে আবার মুসলিমদের নিরাপদ আবাস গড়ে উঠুক, এই দুআ করি।



বিশেষ নিবন্ধ

সংবিধান সংস্কার কমিশন সমীপে কিছু প্রস্তাব



বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

[বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ এর উদ্যোগে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সংবিধান সংস্কার কমিশনের বরাবর উপস্থাপন করা হয় যা বিগত ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবেও 'সংবিধান সংস্কার : আমাদের ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে জাতির উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবসমূহ গ্রন্থণা করেছেন মাওলানা মারজান আহমদ চৌধুরী, বাংলা অনুবাদ করেছেন আহমাদ রায়হান ফারহী, সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ও মাওলানা মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান।–সম্পাদক]

বরাবর
মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ
সংবিধান সংস্কার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এই সংকটাপন্ন সময়ে সংবিধান সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগ্রহণের জন্য আমরা আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আইনি অঙ্গনের বিশেষজ্ঞ হিসেবে সংবিধান, আইন ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আপনাদের অগাধ জ্ঞান রয়েছে। আপনাদের সদয় বিবেচনার জন্য আমরা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু সুপারিশ পেশ করছি। সেই সাথে প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে তুলে ধরছি, যার ভিত্তিতে এই প্রস্তাবগুলো তৈরি করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামি শরিয়তের বিধানসমূহ সমাজ ও রাষ্ট্রে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কেবল একটি সম্পূর্ণ কাঠামোবদ্ধ ইসলামি শাসনব্যবস্থার ওপরই বর্তায়। যেহেতু এই কমিশন রাষ্ট্রের প্রচলিত কাঠামোর ভেতরে থেকে বিদ্যমান (সংস্কারাধীন) সংবিধান নিয়ে কাজ করছে, তাই আমরা এরই উপর ভিত্তি করে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল সুনির্দিষ্ট কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করছি।

প্রস্তাব-১

আমরা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতন্ত্র' অপসারণের প্রস্তাব করছি:

(ক) সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে, যেখানে এগুলোকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে;

(খ) সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থেকে;

(গ) এই শব্দগুলোকে অধিকতর উপযুক্ত শব্দগুচ্ছের সাথে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে। যেমন: ধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক সুবিচার, একটি ন্যায়ানুগ, ন্যায্য বা সমতাভিত্তিক সমাজ, অথবা এমন যে-কোনো শব্দাবলির সাথে যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিমালা ও ইনসাফ-ভিত্তিক সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন বরাবরই ধর্ম ও ধর্মের সাথে রাজনীতির জটিল সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কে পরিপূর্ণ। দেশে প্রচলিত ও প্রভাবসম্পন্ন ন্যারেটিভ বা বয়ান অনুযায়ী, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যে কয়েকটি আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা (সেক্যুলারিজম) ও সমাজতন্ত্র অন্যতম।[১] ১৯৭২ সালের সংবিধানে চারটি ভাবাদর্শকে সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়; যথা- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, যেগুলো পরবর্তীতে 'মুজিববাদ'[২] নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতিকেন্দ্রিক প্রভাবশালী ন্যারেটিভ বা বয়ানসমূহ ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন নীতি হিসেবে উপস্থাপন করেছে[৩] এবং এটিকে বাংলার জনগণের 'অন্তর্নিহিত চেতনা'[৪] হিসেবে দাবি করেছে। পক্ষান্তরে, ইসলামকে (প্রায়শ 'রাজনৈতিক ইসলাম' নামে আখ্যায়িত করা হয়) 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর বিরোধী আদর্শ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। প্রচলিত বয়ান অনুযায়ী, ইসলাম কেবল ১৯৭০ দশকের শেষদিক ও ১৯৮০ দশকের সামরিক শাসনের সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রবেশ করেছে।[৫] এটি সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা মনে করি যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বাঙালি মুসলমানদের অন্তর্নিহিত চেতনা তো নয়ই; এটি কোনো নিরপেক্ষ বা সর্বজনীন আদর্শও নয়।

প্রথমত, নৃতাত্ত্বিক তালাল আসাদ উল্লেখ করেছেন যে, 'সেক্যুলারিজম'-এর ধারণা ইউরোপীয় ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত, যা নির্দিষ্ট কিছু জীবনধারাকে 'গ্রহণযোগ্য' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এবং অন্যগুলোকে উপেক্ষা করে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধগুলো চলার পর অবশেষে ইউরোপের লোকেরা যখন ধর্ম ও সমাজের মধ্যকার পার্থক্যকে গ্রহণ করে নিয়েছিল, কেবল তখনই সেখানে সেক্যুলারিজম একটি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে বিকশিত হয়েছিল।[৬] তবে, আমাদের ইতিহাসে ইউরোপের মতো রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে এমন কোনো সংঘাতের উদাহরণ নেই। দ্বিতীয়ত, সমাজবিজ্ঞানী হোসে ক্যাসানোভা বলেন যে, সেক্যুলারিজম আদর্শিকভাবে ধর্মকে 'অপ্রাসঙ্গিক' করে তোলে এবং কেবল পশ্চিম ইউরোপ এটিকে আধুনিকতার একটি স্বাভাবিক উপজাত হিসেবে বিবেচনা করে। তবে, অ-পশ্চিমা সমাজগুলোতে প্রায়শ আধুনিকতার পাশাপাশি ধর্মীয় পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হয়, যা আধুনিকতার সাথে ধর্মের বিরোধের পূর্বতন ধারণাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।[৭]

তৃতীয়ত, সেক্যুলারিজম ইসলামের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। দার্শনিক সাইয়্যেদ হোসেইন নাসর লিখেছেন যে, ইসলামে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা ধর্মীয় পরিসীমার বাহিরে। ফলে, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ অথবা আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বিষয়াবলির মধ্যে পৃথককরণের কোনো সুযোগ নেই। প্রথমদিককার ইসলামি ভাষ্যগুলোতেও 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'পার্থিব' এর মতো কোনো শব্দের অস্তিত্ব নেই।[৮]

অন্যদিকে, বাংলার ইতিহাস গঠনে ইসলাম অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছে। ১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে, এই অঞ্চলে সুফি-সাধক ও মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে।[৯] তাদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা ও পরবর্তীতে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় একটি সমৃদ্ধ মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে।[১০] উনিশ শতকে *ফরায়েজি আন্দোলন*, *তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া*, *খেলাফত আন্দোলন*[১১] ও পরবর্তীতে বিংশ শতকের শুরুর দিকে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একটি শক্তিশালী মুসলিম চেতনা বিকশিত হয়। ফরায়েজি আন্দোলন এমন সব অঞ্চলে তীব্র হয়ে ওঠে, যেখানে মুসলিম কৃষকরা হিন্দু জমিদার ও ব্রিটিশদের দ্বারা নিপীড়িত ছিল।[১২] অপরদিকে, সৈয়দ আহমদ শহিদ বেরলভি (র.) এর নেতৃত্বাধীন তাসাউফচর্চা ও ব্রিটিশবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য প্রসিদ্ধ তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া বাংলায় উল্লেখযোগ্য সমর্থন লাভ করে। ১৮২০ সালে এই অঞ্চলের দশ হাজারেরও বেশি মুসলমান সৈয়দ আহমদের সাথে কলকাতায় মিলিত হন।[১৩] সৈয়দ তিতুমীরের ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ, নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও কারামত আলী জৌনপুরীর শান্তিপূর্ণ দাওয়াতি কার্যক্রম তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়াকে একটি বহুমুখী আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। অধ্যাপক আইরা লাপিডাসের মতে, ১৮৩১ সালে বালাকোটে শহীদ হওয়া সৈয়দ আহমদের এই আন্দোলন পরবর্তীতে বাংলাসহ উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলিম সংস্কার আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[১৪] পরবর্তীতে, বাংলার শত শত আলেম খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[১৫] ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাঙালি নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং, এটি সহজেই বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক যুগে ইসলাম কেবল একটি সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং এটি মুসলমানদেরকে একটি পরিচয় ও প্রতিরোধের হাতিয়ার প্রদান করেছিল।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি ভাবাদর্শের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ৭ দফা ঘোষণা,[১৬] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৪২ দফা কর্মসূচি,[১৭] কিংবা যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহারে এমন কিছুই ছিল না যা ইসলামি আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ইশতেহারে বলা হয়েছিল: "কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ করে কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।"[১৮]

পাকিস্তান আমলে ধর্মনিরপেক্ষতা কখনো আওয়ামী লীগের আদর্শগত আলোচনায় গুরুত্ব পায়নি। দলটির কোনো রাজনৈতিক প্রচারণায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়নি।[১৯] শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা আন্দোলন, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি, আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের নির্বাচনি ইশতেহার, কিংবা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র– কোনোটাতেই ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্রের উল্লেখ ছিল না।[২০] অতএব, এটি স্পষ্ট যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার জন্য ছিল না; বরং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সামরিক রাষ্ট্র (garrison state) পাকিস্তানের শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এজন্য আলাদা হয়নি যে, এটি একটি ইসলামি রাষ্ট্র ছিল; বরং তারা আলাদা হয়েছিল কারণ পাকিস্তান তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ইসলামি নীতিতে পরিচালিত হচ্ছিল না, উলটো এখানে একটি ঔপনিবেশিক ও দমনমূলক শাসনব্যবস্থা বিরাজমান ছিল।

তবুও, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় হঠাৎ করেই ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে 'মূলনীতি' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এগুলোকে মুক্তিযুদ্ধের 'অনুপ্রেরণা' বলে দাবি করা হয়। কিন্তু, এই দাবি যে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের ওপর কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, তা বিবেচনা করা হয়নি।[২১] যদিও শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে 'ধর্মহীনতা' নয় বলে যুক্তি দেখিয়েছিলেন[২২] এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেনও দাবি করেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অপব্যবহার রোধ করার জন্য তারা বাধ্য হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছিলেন;[২৩] তবুও সময়ে সময়ে বাংলাদেশে 'আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষীকরণ'[২৪], এমনকি 'রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ডি-ইসলামাইজেশন' লক্ষ করা গেছে, যেটিকে প্রফেসর হাতেম বাজিয়ানের ভাষায় 'মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামবিদ্বেষ (ইসলামোফোবিয়া)'-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।[২৫] এ ধরনের কার্যক্রম সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে কখনোই উৎসাহিত করতে পারেনি; বরং রাষ্ট্রযন্ত্রকে একটি দমনমূলক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে, মুসলমানদের ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ধ্বংস করেছে এবং দেশের বিশাল একটি অংশকে তাদের নিজ ভূখণ্ডেই পরবাসী বানিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা নিঃসন্দেহে একটি উড়ে এসে জুড়ে বসা ধারণা,[২৬] যদিও এই প্রস্তাবে এর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানের বক্তব্যের সাথে একমত; তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা এই দেশের সামাজিক চেতনা ও ইতিহাসকে প্রতিফলিত করেনি; বরং এটি ছিল রাজনৈতিক প্রয়োজনে গ্রহণ করা একটি ছলপূর্ণ কৌশল।"[২৭]

একইভাবে, সমাজতন্ত্র একটি বিশ্বব্যাপী ব্যর্থ মতাদর্শ। বাংলার মুসলমানদের সাথে এটির কোনো ঐতিহাসিক যোগসূত্র নেই। বাংলাদেশি মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন নেই, উপরন্তু শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বা একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার জন্য এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির সমাজতন্ত্রেরও দরকার নেই। ইসলাম স্বভাবতই সাম্যের কথা বলে এবং ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।[২৮] ইসলামি শরিয়াহর আদর্শাবলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ধর্মীয় সহনশীলতা, শোষণ দূরীকরণ ও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ন্যায়বিচারব্যবস্থাকে লালন করে এবং ইতিহাস জুড়ে সমৃদ্ধিশালী মুসলিম সভ্যতাগুলো এই আদর্শাবলির বাস্তব রূপায়ণ দেখিয়েছে।

■ প্রস্তাব-২

আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানের প্রস্তাবনায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব" আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এক্ষেত্রে

মৌরিতানিয়া, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যেগুলোর সংবিধানে ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্ব বা দিকনির্দেশনার স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

▪ প্রস্তাব-৩

আমরা প্রস্তাব করছি যে, ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক:
(ক) সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'নৈতিক দিকনির্দেশনার ভিত্তি' হিসেবে;

(খ) সংবিধানের প্রথম ভাগে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে; এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া, তিউনিসিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও আইসল্যান্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলোর সংবিধান একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রধর্মকে স্বীকৃতি দেয়;

(গ) হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য স্বাধীনভাবে পালন ও সংরক্ষণের অধিকার রক্ষার শর্তে।

▪ প্রস্তাব-৪

আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যাতে উল্লেখ করা হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না।

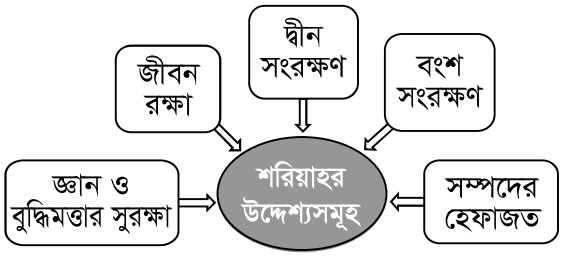
প্রস্তাবসমূহের প্রেক্ষাপট

আমাদের উপরিউক্ত তিনটি প্রস্তাবের (২, ৩ ও ৪) প্রেক্ষাপট হিসেবে আমরা ইসলামি শরিয়াহ ও এর মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যাবলির ওপর ভিত্তি করে একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছি। শরিয়াহকে অনেকেই অজ্ঞতাবশত কেবল কতিপয় ইসলামি দণ্ডবিধির একটি সংকলন মনে করেন। কিন্তু শরিয়াহ কেবল কতিপয় দণ্ডবিধির নাম নয়; বরং এটি পুরো ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস (আকাইদ), ইবাদতের বিধানাবলি (আহকাম) ও নৈতিক নির্দেশনা (আখলাক)। ইসলামি বিদ্বানরা শরিয়াহকে "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সকল বিধান দিয়েছেন" বলে সংজ্ঞায়িত করেন[২৯] এবং এটিকে মুক্তির (নাজাত) পথ হিসেবে দেখেন, যেমনটা ১৩শ শতাব্দীর ফিকহশাস্ত্রবিদ আল-কুরতুবি উল্লেখ করেছেন।[৩০] শরিয়াহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ১৩শ শতকের আরেকজন ফকিহ ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন:

"নিঃসন্দেহে, শরিয়াহ উভয় জগতে আল্লাহর বান্দাদের জন্য প্রজ্ঞা ও কল্যাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর পুরো কাঠামো ন্যায়বিচার, দয়া, কল্যাণ ও প্রজ্ঞার ওপর গঠিত হয়েছে। যে-কোনো বিষয় যা ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম, দয়ার পরিবর্তে নিষ্ঠুরতা, জনকল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ও প্রজ্ঞার পরিবর্তে নির্বুদ্ধিতা বয়ে আনে, তা শরিয়াহর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমেও তা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়।"[৩১]

শরিয়াহকে মোটাদাগে বোঝার একটি কার্যকরী উপায় হচ্ছে মাকাসিদ তথা উদ্দেশ্যগুলোকে বোঝা। মাকাসিদের সংজ্ঞা হচ্ছে, "যা আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্য পূরণ করে।" মাকাসিদে শরিয়াহ এমন একটি শাস্ত্র, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আইনপ্রণয়নের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়গুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়।[৩২] শরিয়াহর উদ্দেশ্যগুলোকে ফকিহগণ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে- অপরিহার্যতা (আদ-দারুরিয়্যাত), প্রয়োজনীয়তা (আল-হাজিয়্যাত) ও সৌন্দর্যপ্রবণতা (তাহ্সিনিয়্যাত)। অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে, ইসলামি শরিয়াহর পাঁচটি প্রধান মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যাবলি রয়েছে: দ্বীন সংরক্ষণ, জীবন রক্ষা, বংশ সংরক্ষণ, বুদ্ধির সুরক্ষা ও সম্পদের হেফাজত।[৩৩]

চিত্র-১:



মাকাসিদ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে শরিয়াহর বিধানগুলো লক্ষ করলে এগুলোর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা উপলব্ধি করা যাবে।

টেবিল-১:

মাকাসিদ ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী শরিয়াহর বিধানসমূহের শ্রেণিবিন্যাস-

শরিয়াহর বিধানাবলি	মাকাসিদ ফ্রেমওয়ার্ক
১) শাহাদাহ ২) নামাজ ৩) রোজা ৪) হজ্জ ৫) যাকাত ইত্যাদি	দ্বীন সংরক্ষণ
১) অবৈধ হত্যা ও ফাসাদ নিষিদ্ধকরণ ২) মিথ্যা সাক্ষ্য ও অবিচারের নিষেধাজ্ঞা ৩) প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস ও মৃত প্রাণী ভক্ষণ নিষিদ্ধ ৪) নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া নিষিদ্ধকরণ ৫) কিসাস (প্রাণদণ্ডের বিধান) কার্যকর করার ব্যবস্থা	জীবন সংরক্ষণ ও জীবনের পবিত্রতা রক্ষা
১) ব্যভিচার ও অশ্লীলতার নিষেধাজ্ঞা ২) সমকামিতা প্রতিরোধ ৩) শালীন পোশাক পরিধানের বাধ্যবাধকতা ৪) বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান	বংশ সংরক্ষণ
১) মদ্যপান ও নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা ২) জাদুবিদ্যা নিষিদ্ধকরণ ৩) জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ প্রদান	জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সুরক্ষা
১) চুরি ও ডাকাতি নিষিদ্ধকরণ ২) জুয়া খেলা ও মজুতদারি নিষিদ্ধ ৩) সুদ, ঘুষ ও অন্যায় লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা ৪) উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান ৫) উত্তরাধিকার আইন কার্যকর ৬) সম্পদের সুষ্ঠু সঞ্চালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান	সম্পদের হেফাজত

শরিয়াহর মাকাসিদ ও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদদের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কুরআন, হাদিস ও ইজমার আলোকে এমন কিছু নীতি তৈরি করতে উৎসাহী করেছে, যেগুলোকে ইসলামি আইনজ্ঞরা ফিকহী বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে ব্যবহার করেন। তন্মোধ্যে রয়েছে, ইসতিহসান– যা ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞকে কুরআন-হাদিসে সরাসরি উল্লেখ নেই এমন বিষয়াবলির ক্ষেত্রে নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সর্বাধিক উপযুক্ত সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এখতিয়ার প্রদান করে; মাসলাহা মুরসালাহ– যা আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও সুবিচারের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়;

এবং উরফ– যা আইনপ্রণয়নের সময় কোনো নির্দিষ্ট সমাজের রীতিনীতি ও প্রথাগুলোকে গুরুত্ব দিতে বলে। সংক্ষেপে, শরিয়াহ ও এর ফিকহি নীতিমালার (উসুল) কোনো বিধান ন্যায়বিচার, দয়া, সামষ্টিক কল্যাণ ও প্রজ্ঞার পরিসীমাকে লঙ্ঘন করে না। কোনো অজ্ঞ বা উগ্রপন্থি ব্যক্তি শরিয়াহর মাকাসিদ ও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলির পরিপন্থীভাবে যতই কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করুক না কেন, কোনো আস্থাভাজন ইসলামি পণ্ডিত এমন ব্যাখ্যাকে সমর্থন করবেন না। এ কারণেই ইসলামি পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই আইএস বা এরকম কোনো গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেন না। শরিয়াহ কিছু অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছে সত্য, কেননা এটি ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জনকল্যাণকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং সমাজকে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

শরিয়াহ প্রথমে ব্যক্তির ইসলাহ তথা শুদ্ধির ওপর জোর দেয়, কারণ ব্যক্তি হলো সমাজের মূল ভিত্তি। এরপর পারিবারিক বিষয়গুলোর দিকে নজর দেয় এবং তারপর সামাজিক ও শাসনব্যবস্থার বিষয়গুলো নিয়ে নির্দেশনা প্রদান করে। পাশাপাশি দুনিয়াবি বিষয়াদির ক্ষেত্রে নিজ জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সুস্থ বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করে। আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন এবং এসব বিষয় পরিচালনার জন্য জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিছক জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে সাহাবিদের অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো কোনো কাজকে অনুমোদন দিয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমরা তোমাদের জাগতিক বিষয় সম্পর্কে অধিকতর অবগত।"[৩৪] তবে এটিও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেক প্রয়োগে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যেন এটি শরিয়াহর কোনো মূলনীতির খেলাফ না হয়। উপরন্তু যেসব বিষয়ে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা আছে সেসব বিষয়ে শরিয়াহর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তো রয়েছেই। উদাহরণস্বরূপ, শাসনব্যবস্থার মতো জনদায়িত্ব পালনের জন্য কুরআন শুরা বা পরামর্শমূলক পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।[৩৫] একইভাবে, শরিয়াহ Presumption of innocence তথা কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে বিবেচনা করাকে বিচারব্যবস্থার মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ হচ্ছে- সাক্ষ্যপ্রমাণের ভার অভিযোগকারীর ওপর; অভিযুক্তের ওপর নয়।[৩৬] অনুরূপভাবে, আর্থিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে যেন সম্পদ কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়।[৩৭] শরিয়াহ সংখ্যালঘুদের ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন,[৩৮] নিরাপদ জীবনযাপন[৩৯] ও আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ সুরক্ষা বিধান করেছে। সীরাতে এর অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়।

শরিয়াহ দয়া ও সুবিচারের মূল্যবোধকে ধারণ করার পাশাপাশি মুসলমানদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে বহুবার সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয়ই দ্বীন খুব সহজ-সরল। কেউ দ্বীনের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করলে সে অবশ্যই পরাভূত হবে।"[৪০], "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকো"[৪১] এবং "সীমালঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হোক"[৪২]। অতএব, বোঝা যায় যে, শরিয়াহ কেবল ইসলামি দণ্ডবিধির একটি সংকলন নয়; বরং এটি এমন একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা, যা ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির পাশাপাশি শাসনপদ্ধতি, বিচার, অর্থনীতি ও আইন প্রণয়নসহ সামষ্টিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও নির্দেশনা প্রদান করে। আমরা স্বীকার করি, ইসলামি শরিয়াহ'র কিছু দণ্ডবিধি হয়তো একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, যেমনটি প্রফেসর ওয়েল হাল্লাক উল্লেখ করেছেন।[৪৩] তবে, যেখানে একটি মুসলিম-প্রধান সমাজ রয়েছে, সেখানে ইসলাম নৈতিক ও আইনি দিকনির্দেশনার সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে হাজির হবেই। লেখক শাদি হামিদ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অন্যান্য ধর্ম যেখানে সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে সহজেই মানিয়ে নেয়, ইসলামের পক্ষে সেটি সম্ভব নয়। কারণ ইসলাম একইভাবে একটি ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এ বিষয়টি ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মনিরপেক্ষীকরণের বিরোধী করে তোলে।[৪৪]

সুতরাং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র, যেখানে মানুষ গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ, সে রাষ্ট্রের সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামি শরিয়াহর মূল্যবোধকে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যদি এসব মূল্যবোধকে উপরিউক্ত মাকাসিদ ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করা হয়। ইসলামি শরিয়াহর মূল্যবোধকে সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জীবন, মর্যাদা, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, সামাজিক সংহতি ও অগ্রগতির জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে, যা ধর্মনিরপেক্ষতা (যেটি ধর্মীয় সম্প্রীতির সীমা ছাড়িয়ে লাইসিটে তথা ফরাসি সেক্যুলারিজম ও কামালবাদ পর্যন্ত যাওয়ার প্রবণতা রাখে), সমাজতন্ত্র ও বিত্তশালীদের তোষণকারী পুঁজিবাদের মতো অস্পষ্ট, লোভাতুর ও জোড়াতালি দেওয়া মতাদর্শের চেয়ে বহুগুণ উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হবে।

পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিক আরও কিছু প্রস্তাব

■ **প্রস্তাব ৫:**

আমরা প্রস্তাব করছি যে, সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে একটি 'ইসলামিক আইডোলজি কাউন্সিল' (ইসলামি মতাদর্শ পরিষদ) গঠন করা হোক, যেটি মিশরের আল-আজহারের পরামর্শবিষয়ক ভূমিকা, মালয়েশিয়ার জাতীয় ফতওয়া কাউন্সিল ও পাকিস্তানের ইসলামিক আইডোলজি কাউন্সিলের মতো সফল মডেলসমূহ থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে। উক্ত কাউন্সিল জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত প্রথিতযশা আলেম ও ইসলামি আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত হবে, যেন এতে বহুমুখী প্রতিনিধিত্ব ও বিশেষজ্ঞতা নিশ্চিত হয়। এই কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্বগুলো হবে:

(ক) শরিয়াহ ব্যাখ্যা করা: শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতিমালার ওপর কর্তৃত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান;

(খ) আইন মূল্যায়ন করা: বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত আইনসমূহ পর্যালোচনা করে সেগুলোকে শরিয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা;

(গ) সরকার ও বিচারবিভাগকে পরামর্শ প্রদান: আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে শরিয়াহর অনুবর্তিতা (compliance) নিশ্চিত করা।

■ **প্রস্তাব ৬:**

আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে LGBTQ+ কার্যক্রমকে মৌলিক বা অন্য কোনো অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। অধিকন্তু;

(ক) 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি সংবিধান বা সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়।

(খ) বিকৃত যৌনাঙ্গ বা অস্পষ্ট যৌন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিদের 'ইন্টারসেক্স' হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা উচিত এবং তাদের মর্যাদা ও

অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মূলধারার সমাজে অঙ্গীভূত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

■ প্রস্তাব ৭:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, মুসলমানদের বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ও অন্যান্য পারিবারিক বিষয় পূর্ণরূপে ইসলামি নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হওয়ার অধিকারকে সংবিধানে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। সাথে এই বিষয়টিও থাকবে যে, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা পারিবারিক ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় তাদের নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি অনুসারে পরিচালনার অধিকার লাভ করবে।

■ প্রস্তাব ৮:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যেটি নিশ্চিত করে যে, পারিবারিক আইন ও জনসাধারণের নৈতিকতার বিষয়ে বিচারিক সিদ্ধান্তগুলো (Judicial decisions) ইসলামি আইনি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

■ প্রস্তাব ৯:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হোক, যার সদস্যবৃন্দ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তা তদারকির দায়িত্বে থাকবে। এ কমিশনে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক আলেম-উলামা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন, যারা শিক্ষাব্যবস্থায় শরিয়াহর নীতি-আদর্শের বিপরীত কোনো বিষয় যাতে অন্তর্ভুক্ত না হয় তা নিশ্চিত করবেন। ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

■ প্রস্তাব ১০:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিকে সহজতর করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হোক:

(ক) নৈতিকতা ও নৈতিক বিকাশের নীতিমালার সাথে সমঞ্জসতা নিশ্চিত করে মুসলমানদের জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক ইসলামিক স্টাডিজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাধ্যতামূলক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

(খ) বিবাহকে একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমর্থন ও উৎসাহিত করার বিধান রাখা, যা পারিবারিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করবে।

(গ) শিশু ও পরিবার কল্যাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা, যার মধ্যে থাকবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অসহায় পরিবারগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তার সুযোগ।

(ঘ) জনসমক্ষে অশালীনতা ও অনৈতিক আচরণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা সমাজে শালীনতাবোধ ও নৈতিক আচরণের সংস্কৃতি গড়ে তুলবে।

■ প্রস্তাব ১১:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ন্যায়পালের কার্যালয় (দিওয়ান আল-মুহতাসিব) সক্রিয় ও প্রাতিষ্ঠানিক করা হোক। সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে এই কার্যালয়টির কার্যনির্বাহ করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের অভিযোগ সমাধান, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ইসলামি বিধিবিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচার বলবৎ করা।

■ প্রস্তাব ১২:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে ইসলামি অর্থনীতি ও শ্রম অধিকার বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বিধান সংযুক্ত করা হোক। এই বিধানগুলোতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(ক) সুদমুক্ত ব্যাংকিং: বাংলাদেশের জন্য একটি স্বচ্ছ ও ভোক্তাবান্ধব সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ কাঠামো প্রণয়ন। এই কাঠামো নিম্নোক্ত সফল মডেলসমূহ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে:

১) মালয়েশিয়া: Shariah Advisory Council শরিয়াহর নীতিমালা মেনে চলা নিশ্চিত করে এবং সুকুক (ইসলামি বন্ড) প্রচলিত বন্ডের শরিয়াহসম্মত বিকল্প প্রদান করে।

২) সুদান: সম্পূর্ণ ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা বিদ্যমান, যেখানে মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা ও ইজারা-এর মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৩) পাকিস্তান: প্রতিষ্ঠানগুলো স্টেট ব্যাংকের Shariah Advisory Board-এর তত্ত্বাবধানে Shariah Governance Framework মেনে চলে।

৪) বাহরাইন: শরিয়াহসম্মত বিনিয়োগকে সমর্থন করে। বাহরাইনভিত্তিক AAOIFI ইসলামি আর্থিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিকভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

(খ) সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য ন্যায়সংগত সম্পদ বিতরণের নীতিমালা তৈরি;

(গ) দরিদ্র বিমোচন, সামাজিক কল্যাণে সহায়তা এবং যাকাত সংগ্রহ ও পরিচালনার জন্য একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ যাকাত বোর্ড স্থাপন;

(ঘ) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা রক্ষার জন্য মদ ও নেশাজাত দ্রব্যের বিক্রি ও ব্যবহার প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঙ) ভোক্তাদের সুরক্ষা ও বাজার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সিন্ডিকেট, মজুদদার ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) শ্রমিকদের মর্যাদা ও ন্যায়সংগত বেতন কাঠামো নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের জন্য ন্যায্য ও সময়োপযোগী মজুরি প্রদানের বিধান করা।

■ প্রস্তাব ১৩:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কোনো ধর্মকে লক্ষ্য করে উদ্দেশ্যমূলক উসকানি বা বৈরিতার কাজ নিরুৎসাহিত করার জন্য স্পষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক। সেই সাথে এই সুরক্ষাগুলো যাতে যুক্তিসম্মত আলোচনা বা অ্যাকাডেমিক অনুসন্ধান দমন করার জন্য অপব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করা উচিত। এমন বিধান বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সম্প্রীতি প্রচারের জন্য সহায়ক হবে।

■ প্রস্তাব ১৪:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে এমন আইনি বাধ্যবাধকতামূলক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা রাষ্ট্রে বসবাসরত ব্যক্তিদের গুমের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে এবং অন্যায্য গ্রেফতার বা আটক প্রতিরোধে সুরক্ষাগুলোকে শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি, আমরা সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত না থাকা মৌলিক অধিকারগুলো যুক্ত করার সুপারিশ করছি। যেমন: ভোটাধিকার, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার, ভোক্তা সুরক্ষার অধিকার ইত্যাদি।

■ প্রস্তাব ১৫:
আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করা হোক

এবং ফ্রান্স, পর্তুগাল ও ফিনল্যান্ডের মডেলগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি সেমি-প্রেসিডেন্সিয়াল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতা বিভাজিত হবে, যা সুষম শাসন (balanced governance), বর্ধিত জবাবদিহিতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্রপতি পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা তত্ত্বাবধান করতে পারেন এবং প্রধানমন্ত্রী অভ্যন্তরীণ শাসন ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলির ওপর মনোযোগ দিতে পারেন। দুটি দপ্তরের মধ্যে সংঘাত প্রতিরোধে দায়িত্বের স্পষ্ট বিভাজন ও ক্ষমতার ভারসাম্য (checks and balances) নিশ্চিত করা আবশ্যক।

■ প্রস্তাব ১৬:

আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধান ক্ষমতার পৃথক্করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতিগুলোকে শক্তিশালী করুক, যাতে ভারসাম্যপূর্ণ শাসন ও বর্ধিত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। এটি অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

(ক) নির্বাহী, আইনসভা ও বিচারবিভাগের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা, যাতে দায়িত্বের অধিক্রমণ (overlaps) প্রতিরোধ ও ক্ষমতার ভারসাম্য (checks and balances) নিশ্চিত হয়।

(খ) স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৃহত্তর প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা, যাতে তারা জনসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোকে কার্যকরভাবে সমাধান করতে পারে এবং অংশগ্রহণমূলক শাসনকে উৎসাহিত করতে পারে।

(গ) সরকারের প্রতিটি শাখার কার্যক্রম নিরীক্ষণের জন্য স্বাধীন নজরদারি সংস্থা গঠন করা, যাতে কোনো একক প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ করা যায়।

■ প্রস্তাব ১৭:

আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানে জাতীয় নির্বাচনের সময় একটি তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এ সরকারের সীমিত ক্ষমতা থাকবে এবং এটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে কেবল নির্বাচনি প্রক্রিয়া পরিচালনা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাংবিধানিক নীতিমালা সমুন্নত রাখার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। এর গঠন, ক্ষমতা ও মেয়াদ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত থাকবে। পদ্ধতিটি সফল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মডেল থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে, যেমন: পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, নেপালের রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যবহার এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে ইতালি ও গ্রিসে টেকনোক্র্যাটিক বা তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের নিয়োগ। তবে, এই কাঠামো বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও আইনি প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গঠন করা উচিত, যাতে তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও নির্বাচনের সময় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

■ প্রস্তাব ১৮:

আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধানের কাঠামো এমনভাবে গঠন করা হোক, যাতে সংবিধান সংশোধনে স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করা যায় এবং ভবিষ্যতে কোনো সরকার এটিকে স্বৈরাচারী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারে। এটি অর্জন করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়গুলোর মাধ্যমে:

(ক) মৌলিক অধিকার, শাসন কাঠামো বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে প্রভাবিত করে এমন সাংবিধানিক সংশোধনীর জন্য গণভোট বাধ্যতামূলক করা।

(খ) সব ধরনের সাংবিধানিক সংশোধনীর জন্য সংসদে সুপারমেজরিটি ভোটের প্রয়োজনীয়তা আরোপ করা।

(গ) প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোকে বিচারিক পর্যালোচনার (judicial review) আওতায় আনা, যাতে সেগুলো সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর (basic structure) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

এই পদ্ধতিগুলো সুইজারল্যান্ডের গণভোট ব্যবস্থা ও জার্মানির Protection for Fundamental Principles এর মতো সংবিধান পরিচালনার উৎকৃষ্ট চর্চাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, যা সংবিধানের অখণ্ডতা রক্ষা করবে।

■ প্রস্তাব ১৯:

আমরা প্রস্তাব করছি যে, সংবিধান আন্তর্জাতিক শান্তি, সংহতি ও ন্যায়বিচারের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি আরও জোরদার করবে এবং এটি নিশ্চিত করবে যে, বাংলাদেশের কোনো সরকার:

(ক) দমনমূলক বা বর্ণবাদী কোনো রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকবে।

(খ) স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য মানবজাতির অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

(গ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

এই সুপারিশগুলো বিশেষভাবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত, যেগুলো ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি, কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আন্তরিকভাবে এই প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করবেন।

মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা সকলের সাফল্য কামনা করছি।

তথ্যপঞ্জি

১. Riaz, A. (2004). *God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh.* Rowman & Littlefield, Lanham, MD.

২. Huq, A. F. (1973). *Constitution-Making in Bangladesh, Pacific Affairs,* 46, 59-76.

৩. Riaz, A. (2021). More Than Meets the Eye: The Narratives of Secularism and Islam in Bangladesh. *In Ghosts from the Past?* 105-122. Routledge, London.

৪. Khatun, S. (2010). Examining the Discourses of Political Islam in Bangladesh. *Anthropology Journal, 10*(1), 69-82.

৫. Ahamed, E., & Nazneen, D. R. J. A. (1990). Islam in Bangladesh: Revivalism or Power Politics? *Asian Survey*, 795-808.

৬. Asad, T. (2003) *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity.* Stanford University Press, Stanford, CA.

৭. Casanova, J. (2009). The Secular and Secularisms. *Social Research: An International Quarterly, 76*(4), 1049-1066.

৮. Nasr, S. H. (2002). *Islam: Religion, History, and Civilization.* Harper One, New York.

৯. Khan, M. M. (2013). *The Muslim Heritage of Bengal: The Lives, Thoughts and Achievements of Great Muslim Scholars, Writers and Reformers of Bangladesh and West Bengal.* Kube Publishing Ltd, Leicestershire.

১০. Khan, Z. R. (1985). Islam and Bengali Nationalism. *Asian Survey,* 25(8), 834-851.

১১. Riaz, A. (2009). Interactions of 'transnational' and 'local' Islam in Bangladesh in transnational Islam. In *South and Southeast Asia: Movements, Networks, and Conflict Dynamics.* The National Bureau of Asian Research, Seattle, WA, 79– 100.

১২. https://en.banglapedia.org/index.php/Faraizi_Movement. Retrieved on November 17, 2024

১৩. https://en.banglapedia.org/index.php/Tariqah-i-Muhammadiya. Retrieved on November 17, 2024.

১৪. Lapidus, I. (1997). Islamic Revival and Modernity: The Contemporary

Movements and the Historical Paradigms. *Journal of the Economic and Social History of the Orient, 40*(4), 444-460, Brill, Leiden.
১৫. Shah, M. (2001). The Bengal Muslims and the world of Islam: Pan-Islamic trends in colonial Bengal as reflected in the press. In *Understanding the Bengal Muslims.* Oxford University Press, Noida, 86–112.
১৬. Afzal, M. R. (1976). *Political Parties in Pakistan, 1947–1958*. National Commission on Historical and Cultural Research, Islamabad.
১৭. Islam, M. N., Islam, M. S., Islam, M. N., & Islam, M. S. (2020). Piety and Politics: Secularization and Islamization in Bangladesh. *Islam and Democracy in South Asia: The Case of Bangladesh,* 167-214.
১৮. Ahad, O. (2012). *Jatio Rajniti: 1945 Theke 75*. Bangladesh Co-operative Book Society, Dhaka.
১৯. Hakim, M. A. (1998). The Use of Islam as a Political Legitimization Tool: The Bangladesh Experience, 1972–1990. *Asian Journal of Political Science, 6*(2), 98-117.
২০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.). (১৯৮২). বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪-৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২১. Hossain, A. A. (2015). Contested National Identity and Political Crisis in Bangladesh: Historical Analysis of the Dynamics of Bangladeshi Society and Politics. *Asian Journal of Political Science, 23*(3), 366-396.
২২. O'Connell, J. T. (1976). Dilemmas of Secularism in Bangladesh, *Journal of Asian and African Studies, 11,* 64-81.
২৩. Islam, M. N., & Islam, M. S. (2018). Islam, Politics and Secularism in Bangladesh: Contesting the Dominant Narratives. *Social Sciences, 7*(3), 37.
২৪. Fahim, M. A. A. I. (2022). Inventing Islam(ism): De-Islamization under Secular Authoritarianism in Bangladesh. *ReOrient, 7*(2), 158-181.
২৫. Bazian, H. (2018) Religion-Building and Foreign Policy. In Bayrakli, E. and Hafez, F. (eds). *Islamophobia in Muslim Majority Societies,* 21–44, Routledge, London.
২৬. Hasan, M. (2017). The Diverse Roots of the 'Secular' in East Pakistan (1947–71) and the Crisis of 'Secularism' in Contemporary Bangladesh. *History and Sociology of South Asia, 11*(2), 156-173.
২৭. Maniruzzaman, T. (1990). Bangladesh Politics: Secular and Islamic Trends. *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh,* 63-93.
২৮. Arnold, T. W. (1913). *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith.* Constable & Company Ltd, London.
২৯. Zaidan, A. K. (2005). *Al-Madkhal li Diraasah al Shariah al Islamiah.* Al-Resalah Publishers, Beirut.
৩০. Al-Qurtubi, Abu Abdullah. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Quran,* vol. 8, p. 39, Al-Resalah Publishers, Beirut.
৩১. Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abu Bakr, (1996). *I'laam al-Mouwaqi'in 'an Rabb il-'Alamin,* vol. 3, Dar al-Kutub al Ilmiyah, Beirut.
৩২. Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah: An Introductory Guide*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), Herndon, VA.
৩৩. Al-Ghazali, Abu Hamid, (2018). *al-Mustafa min Ilm al Usul.* Dar ul Tuqafah, Doha.
৩৪. Muslim ibn Hajjaj, *Sahih,* The Book of Virtues, Hadith no: 2363.
৩৫. Quran, 42:38; ৩৬. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra,* The Book of Accusation and Evidences, Hadith no: 21201; ৩৭. Quran, 59:7; ৩৮. Quran, 2:256; ৩৯. Quran, 60:8 ৪০. Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Sahih,* The Book of Faith, Hadith no: 39.
৪১. An-Nasa'i, Ahmad ibn Shu'ayb, *al-Sunan al-Sughra,* The Book of Hajj, Hadith no: 3057.
৪২. Abu Dawud, Sulaiman ibn Ash'ath, *Sunan,* The Book of Sunnah, Hadith no: 4608.
৪৩. Hallaq, W. B. (2012). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament.* Columbia University Press, NY.
৪৪. Hamid, S. (2016). *Islamic exceptionalism: How the struggle over Islam is reshaping the world.* St. Martin's Press, NY



এই মাসে এই চাঁদে

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) এর ইন্তিকাল

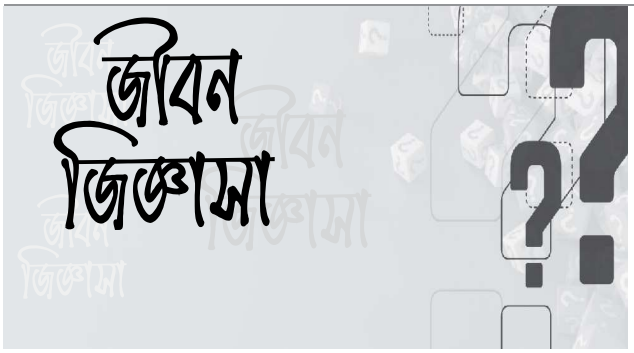
কুতবুল আকতাব হযরত শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) এর পূর্ববর্তী বংশধর দিল্লীর কোনো এক সুলতান মোগল সম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত দুর্গসমুহের যে দুর্গটি পুরাতন সিলেট জেলার (বর্তমান কাছাড় জেলার) বদরপুরের পুরান বাজারের কাছে নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, সেই দুর্গের জন্য দিল্লীর অধিবাসী চারজন সম্ভ্রান্ত শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান বংশীয় সামরিক কর্মকর্তা প্রেরণ করা হয়েছিল। অবশেষে তাঁদের পরবর্তী বংশধরেরা বদরপুর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতা শাহ মুহাম্মদ বাছির এই খান্দানের একজন নামকরা লোক ছিলেন। ইয়াকুব বদরপুরী (র.) শৈশবেই পিতা-মাতাকে হারান এবং তাঁর মামার তত্বাবধানে লালিত পালিত হন। বাগবাড়ী নিবাসী মাওলানা নজিব আলী সাহেবের কাছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি যথাক্রমে মাদরাসা-ই আলিয়া ফুলবাড়ী ও মাদরাসা-ই আলিয়া কটকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর ভারতবর্ষের ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র রামপুর আলিয়া মাদরাসায় চলে যান এবং সেখানে হযরত মাওলানা ফযলে হক রামপুরী (র.), আব্দুল হক খয়রাবাদী (র.) ও সুনামধন্য মুহাদ্দিস মাওলানা ইর্শাদ হোসাইন রামপুরী (র.) প্রমুখ উলামায়ে কিরামের কাছে দাওরায়ে হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে চূড়ান্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর অন্তরে ধ্যান ধারণার প্রেরণা ও আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি কামিল মুর্শিদের অনুসন্ধানে ছিলেন। তবে এই অনুসন্ধানে চেষ্টার চেয়ে আল্লাহর তরফ থেকে কোন ইঙ্গিত প্রাপ্তির উপর তিনি বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। এই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ জৈনপুরী (র.) তাঁকে আহ্বান করছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাবো? উত্তরে জৈনপুরী (র.) বললেন, কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর নামক স্থানে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করুন। স্বপ্ন দেখার একদিন পর হযরত বদরপুরী (র.) চাঁদপুরে পৌঁছলেন । এদিকে হযরত মাওলানা জৈনপুরী (র.) খাদিমগণকে বিশেষভাবে বলে রাখলেন, যদি সিলেট থেকে কোন আলিম আসেন তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবে। ইয়াকুব বদরপুরী (র.) চাঁদপুর স্টেশনে গাড়ি থেকে নামার পর জানা গেলো তিনি সিলেট থেকে এসেছেন। তখন খাদিমগণ বললেন হাফিয আহমদ জৈনপুরী (র.) তিনদিন যাবত আপনার অপেক্ষা করছেন। একথা শুনে ইয়াকুব বদরপুরী (র.) অবাক হয়ে গেলেন। যাইহোক, জৈনপুরী (র.) সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে তিনবার প্রশ্ন করলেন, আপনি কী চান? বদরপুরী (র.) তিনবারই উত্তরে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি চাই। তারপর জৈনপুরী (র.) তাঁকে বাইয়াত করালেন। তরীকার সবকসমূহ বাতলিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে মাকামে ফানাহ, বাকা, মুশাহিদা ইত্যাদির স্তরে উন্নীত হওয়ার পর তাকে খিলাফাতনামা প্রদান করলেন। তখন বদরপুরী (র.) তাঁর কাছে আরও কিছুদিন থাকার জন্য কেঁদে কেঁদে অনুনয় করলেন। তখন হাফিয আহমদ জৈনপুরী (র.) জযবায় বদরপুরী সাহেবের বুকে সজোরে স্বীয় আংটি দ্বারা চাপ প্রয়োগ করে বললেন, এখানে আপনার খিদমতের আর প্রয়োজন নেই। ইনশাআল্লাহ সবকিছু হয়ে যাবে। তারপর বদরপুরী (র) জিজ্ঞাসা করলেন, পুনরায় কোন জায়গায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে? জৈনপুরী (র.) বললেন, আর দেখা হবে না । আল্লাহর নেক বান্দারা যা বলে থাকেন তা বাস্তবিকই সত্য। এই দিনেই তিনি বদরপুরী সাহেবকে বিদায় দিয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা হন এবং সফরেই ইন্তিকাল করেন। বদরপুরী (র.) প্রায়ই বলতেন, হাফিয আহমদ জৈনপুরী (র) আমার বুকে আংটি দ্বারা চাপ প্রয়োগের সময় যে উষ্ণতা অনুভব করেছিলাম এখনও তা অনুভব করি। এই উষ্ণতা তাঁর মৃত্যুর পরও বাকি ছিল। ইয়াকুব বদরপুরী (র.) এর ইন্তিকালের পর তার ছাহেবজাদা মাওলানা মাহমুদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, ইন্তিকালের প্রায় আঠারো ঘন্টা পর আমার ওয়ালিদ মুহতারামকে গোসল দেওয়া হয়। গোসলের সময় শরীরে হাত দিয়ে দেখলাম শরীর স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা কিন্তু বুক থেকে কোমর পর্যন্ত এত গরম যে, মনে হচ্ছিল যেন জ্বর উঠেছে।

হযরত ইয়াকুব বদরপুরী (র.) কাছাড় কাঠিগড়া মাদরাসা, আসামের জয়নগর মাদরাসা ও বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় দীর্ঘদিন নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনি শিক্ষাদানে মশগুল ছিলেন। তিনি বদরপুর আলিয়া মাদরাসা ও দারুল হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও স্থায়িত্ব তাঁর উপর নির্ভর করতো । তাঁর উদ্যোগে বহু মাদরাসা স্থাপন করা হয়।

হযরত মাওলানা জৈনপুরী (র.) এর খিদমত থেকে বিদায় নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মানুষের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মানুষের কাছে প্রকৃত বিষয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। দলে দলে লোক তাঁর কাছে বাইয়াত হতে থাকে। বদরপুরী (র) আজীবন তাবলীগ ও হিদায়াতের কাজে মশগুল ছিলেন। সিলেট, কাছাড় ও নওয়াগাঁও জেলার বহু লোক তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাছাড়া গোয়ালপাড়া ডিব্রোগড়, ডিগবই, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা ও অন্যান্য জেলায় তাঁর বহু মুরীদ ছিলেন। উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাঁর সিলসিলাহভুক্ত ছিলেন। তাঁর খলীফাগণের দ্বারা দ্বীনি খিদমত জারি আছে। বাংলাদেশের খলীফাগণের মধ্যে তাঁর জামাতা ও তাঁর স্থালাভিষিক্ত খলীফা রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলা (র.) দ্বারা মানুষের হিদায়াত, ইলমে দ্বীন ও তরীকতের খিদমত, বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের খিদমাত জারি আছে। ইয়াকুব বদরপুরী (র.) সব প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে পূর্ণ আদর্শবান ছিলেন। বিশেষত: দানশীলতা, মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট ছিল। তাই লোকজন তাঁকে হাতিম তাঈ আখ্যা দিয়াছিল। পবিত্র কুরআনের সাথে তাঁর অন্তর অটুট বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তিনি তাজবীদের সাথে শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করার বিশেষ তাগিদ করতেন। দুরুদ ও ওয়াযীফার অভ্যাস কোনোদিন ছাড়তেন না।

ইয়াকুব বদরপুরী (র.) ১৩৭৭ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসের ২৯ তারিখ ১৯৫৮ ইংরেজীর ১৯শে জানুয়ারি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ১০৪ বছর।



জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা

হুসাইন আহমদ
রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাযিল মাদরাসা
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

প্রশ্ন: আমি আসরের নামাযের ৪ নং রাকাআতে শামিল হলাম। এখানে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করে আত্তাহিয়্যাতু পুরোটা পড়ব নাকি অর্ধেক পড়বো? অবশিষ্ট ৩ রাকাআত নামায আমি কীভাবে আদায় করবো?

জবাব: জামাআত নামাযে ইমামকে কোন রাকআতে রুকুতে থাকাবস্থায় ১ তাসবীহ পরিমাণ সময় পেলে উক্ত রাকআত পেয়েছেন বলে পরিগণিত হবে। সুতরাং সেভাবে ইমামকে পেয়ে থাকলে আপনার জন্য ইমামের সালাম ফেরানোর পর অবশিষ্ট ৩ রাকাআত পূর্ণ করতে হবে। আর এ অবস্থায় ইমামের শেষ বৈঠককালে তার অনুসরণে প্রথম বৈঠক অতিরিক্তভাবে করতে হবে। এতে কেবল তাশাহহুদ পড়বেন। দুরূদ ও দুআয়ে মাসূরা পড়তে হবে না। পরবর্তী নিজের সম্পাদনকৃত ১ম রাকাআতে সানা, তাআউয (আউযুবিল্লাহ), তাসমিয়াহসহ (বিসমিল্লাহ) সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলাবেন ২য় রাকআতে কেবল তাসমিয়াহ পড়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোর পর যথানিয়মে সে রাকআত পূর্ণ করে প্রথম বৈঠক করবেন এবং কেবল তাশাহহুদ পড়বেন। অতঃপর যথানিয়মে ৪র্থ রাকআত সম্পন্ন হলে শেষ বৈঠক করবেন এবং তাশাহহুদ, দুরূদ ও দুআয়ে মাসূরাহ পাঠ করে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামায শেষ করবেন। (রাদ্দুল মুহতার, ১/৫৯৬)

আর ইমামকে ৪র্থ রাকআতে রুকুর পর পেলে ইমামের সাথে কোন রাকআত না পাওয়ার পর ও ইমামের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়বেন। এটি অতিরিক্ত বৈঠক যা ইমামের অনুসরণে করতে হয়। এ বিষয়ে আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন-

لِأَنَّ الْقَعْدَةَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ الْمَسْبُوقَ بِثَلَاثٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ يَقْعُدُ ثَلَاثَ قَعَدَاتٍ كُلٌّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَاجِبٌ وَالثَّالِثَةُ هِيَ الْأَخِيرَةُ وَهِيَ فَرْضٌ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَسَائِلِ الْمَسْبُوقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

নামাযে বৈঠক কখনো দুইয়ের অধিক হয়ে থাকে। কেননা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে যিনি তিন রাকআত না পেয়ে মাসবূক হবেন তাকে তিনটি বৈঠক করতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক ওয়াজিব হিসেবে এবং তৃতীয় বৈঠক ফরয হিসেবে করতে হবে। (আল বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭-৩১৮)

মো. আব্দুর রহমান রোমান
গিয়াসনগর, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন-১: ইসলামী শরীআহ মুতাবিক কাদেরকে বিবাহ করা জায়িয, আর কাদেরকে বিবাহ করা না জায়িয, জানালে উপকৃত হবো।

প্রশ্ন-২: কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর দুধ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পান করে ফেলে, ঐ স্ত্রী কি স্বামীর জন্য জায়িয থাকবে, নাকি নাজায়িয হয়ে যাবে? জানালে উপকৃত হব।

জবাব-১: ইসলামী শরীআতে যেকোনো পুরুষের জন্য ১৪ নারীকে বিবাহ করা হারাম, তদ্রুপ যেকোনো নারীর জন্য ১৪ জন পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো হারাম। উক্ত ১৪ জনকে ইসলামী শরীআতে মাহরাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়িয এবং তাদের মধ্যে পর্দা করার প্রয়োজন নেই।

পুরুষের মাহরাম ১৪ জন হলেন-
১. মা ২. ফুফু (বাবার বোন) ৩. খালা (মায়ের বোন) ৪. শাশুড়ি (স্ত্রীর মা) ৫. দুধ মা (ছোট বেলায় যে মায়ের দুধ পান করা হয়েছে) ৬. নিজের বোন ৭. নানি (মায়ের মা) ৮. দাদি (বাবার মা) ৯. নাতনি (আপন ছেলে ও মেয়ের কন্যা) ১০. দুধ বোন ১১. মেয়ে ১২. ভাতিজি (আপন ভাইয়ের মেয়ে) ১৩. ভাগনি (আপন বোনের মেয়ে) ১৪. ছেলের বউ।

উক্ত ১৪ জন ছাড়াও একজন পুরুষের জন্য আরও কয়েক শ্রেণির নারীর সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া হারাম। তারা হলেন-

১. একসঙ্গে চারজনের অধিক নারীকে বিয়ে করা হারাম।

২. ঘনিষ্ঠতম দুই নারীকে একসঙ্গে বিয়ে করা হারাম। অর্থাৎ, এমন দুইজন দুধ সম্পর্কীয় বা বংশ সম্পর্কীয় নারীকে একসঙ্গে বিয়ে করা, যাদের একজনকে পুরুষ ধরা হলে অন্যজনের সঙ্গে তার বিয়ে বৈধ হবে না। যেমন- ফুফু-ভাতিজি ও আপন দুই বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করা হারাম।

কারণ, এদের মধ্যে ফুফুকে যদি চাচা মনে করা হয় তাহলে চাচার সঙ্গে ভাতিজির বিয়ে হারাম, আবার ভাতিজিকে যদি ভাতিজা মনে করা হয়, তাহলে ফুফুর সঙ্গে ভাতিজার বিয়ে বৈধ নয় অথবা দুই বোনের মধ্যে কোনও একজনকে ভাই মনে করা হলে ভাইয়ের জন্য বোনকে বিয়ে করা হারাম।

৩. স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার পর কোনো ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা বৈধ হবে না।

৪. অন্য পুরুষের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে তাকে বিয়ে করা বৈধ হবে না।

৫. মুসলিম পুরুষের জন্য অমুসলিম নারীকে বিয়ে করা হারাম।

৬. কোনও নারীর জন্য নিজের গোলাম বা দাসকে বিয়ে করা হারাম।

৭. স্বামীর জন্য নিজের তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম। তবে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তালাক পাওয়া কিংবা স্বামী মারা গেলে প্রথম স্বামী আবারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

৮. যে নারীর সঙ্গে যিনা করা হয়েছে বা যৌন উত্তেজনার সঙ্গে যে নারীকে স্পর্শ বা চুমু দেওয়া হয়েছে- এমন নারীর মেয়ে, নাতনি বা মা, নানিকে বিয়ে করা হারাম।

এ সম্পর্কে আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ কিতাবে লিখেছেন-

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ. وَهُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَالْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ فَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ نِكَاحًا وَوَطْئًا وَدَوَاعِيَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ فَالْأُمَّهَاتُ: أُمُّ الرَّجُلِ وَجَدَّاتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَأَمَّا الْبَنَاتُ فَبِنْتُهُ الصُّلْبِيَّةُ وَبَنَاتُ ابْنِهِ وَبِنْتُهُ وَإِنْ سَفَلْنَ وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ وَكَذَا بَنَاتُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَإِنْ سَفَلْنَ، وَأَمَّا الْعَمَّاتُ فَثَلَاثٌ عَمَّةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَعَمَّةٌ لِأَبٍ وَعَمَّةٌ لِأُمٍّ وَكَذَا عَمَّاتُ أَبِيهِ وَعَمَّاتُ أَجْدَادِهِ وَعَمَّاتُ أُمِّهِ وَعَمَّاتُ جَدَّاتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَأَمَّا عَمَّةُ الْعَمَّةِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْعَمَّةُ الْقُرْبَى عَمَّةً لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَعَمَّةُ الْعَمَّةِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَتْ الْقُرْبَى عَمَّةً لِأُمٍّ فَعَمَّةُ الْعَمَّةِ لَا تَحْرُمُ وَأَمَّا الْخَالَاتُ فَخَالَتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالَتُهُ لِأَبٍ وَخَالَتُهُ لِأُمٍّ وَخَالَاتُ آبَائِهِ

وَأُمَّهَاتِهِ وَأَمَّا خَالَةُ الْخَالَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْخَالَةُ الْقُرْبَى خَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ فَخَالَتُهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْقُرْبَى خَالَةً لِأَبٍ فَخَالَتُهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ

الْقِسْمُ الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِيَّةِ. وَهِيَ أَرْبَعُ فِرَقٍ: (الْأُولَى) أُمَّهَاتُ الزَّوْجَاتِ وَجَدَّاتُهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ عَلَوْنَ (وَالثَّانِيَةُ) بَنَاتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ بِشَرْطِ الدُّخُولِ بِالْأُمِّ، كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ سَوَاءٌ كَانَتْ الِابْنَةُ فِي حِجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ. وَأَصْحَابُنَا مَا أَقَامُوا الْخَلْوَةَ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حُرْمَةِ الْبَنَاتِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي نَوْعٍ مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ. (وَالثَّالِثَةُ) حَلِيلَةُ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَابْنِ الْبِنْتِ وَإِنْ سَفَلُوا دَخَلَ بِهَا الِابْنُ أَمْ لَا. وَلَا تَحْرُمُ حَلِيلَةُ الِابْنِ الْمُتَبَنَّى عَلَى الْأَبِ الْمُتَبَنِّي هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. (وَالرَّابِعَةُ) نِسَاءُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَوْا فَهَؤُلَاءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى التَّأْبِيدِ نِكَاحًا وَوَطْئًا، كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ. وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. فَلَوْ تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ بَلْ بِالْوَطْءِ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. وَتَثْبُتُ بِالْوَطْءِ حَلَالًا كَانَ أَوْ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. فَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ وَابْنَتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ، وَكَذَا تَحْرُمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى آبَاءِ الزَّانِي وَأَجْدَادِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَأَبْنَائِهِ وَإِنْ سَفَلُوا، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩-২৭৪; তাবঈনুল হাকাইক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১)

জবাব-২: কোনো স্বামী তার স্ত্রীর দুধপান করলে উক্ত স্ত্রী তার জন্য হারাম হয় না। কেননা দুধ পানের কারণে কোন মহিলা কারো জন্য হারাম হওয়ার জন্য দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধপান করা শর্ত। এ সম্পর্কে সুনান আত তিরমিযী গ্রন্থের হাদীসে এসেছে-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ " قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا.

-হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, দুধ ছাড়ানোর বয়সের পূর্বে স্তনের বোটা হতে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ না গেলে দুধপানের নিষিদ্ধতা কার্যকর হয় না।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যরা মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, কোন শিশু দুই বছরের কম বয়সে দুধ পান করলেই বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে। কিন্তু দুই বছরের পর দুধ পান করলে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে না। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-১১৫২; পরিচ্ছেদ-باب ما جاءَ أنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إلا في الصِّغَرِ دُونَ الحَوْلَيْنِ)

হাবিবুর রহমান
লন্ডন, যুক্তরাজ্য

প্রশ্ন: ফরয বা সুন্নাত নামাযে ভুলে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নাস পড়লে পরবর্তী রাকআতে কোন সূরা পড়ব? সুরা বাকারার প্রথম থেকে আবার পড়া যাবে?

জবাব: ফরয বা সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকআতে কেউ সূরা ফাতিহার পর ভুলে সূরা নাস পড়ে ফেললে পরবর্তী রাকআতে সে আবারো সূরা নাস পড়বে। এমতাবস্থায় দুই রাকআতে একই সূরা পাঠ তার জন্য মাকরূহ নয়। তবে যদি নামাযের কিরাআতে কুরআন মাজীদের খতম সমাপ্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াকালীন সময়ে দুই রাকআত বিশিষ্ট কোনো নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা নাস পড়ে থাকে তাহলে পরবর্তী রাকআতে সে (সূরা ফাতিহার পর) কিরাআত হিসেবে সূরা বাকারার শুরু থেকে কিছু পড়ে নিতে পারবে।

এ সম্পর্কে আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ কিতাবে লিখেছেন-

وَلَوْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةً وَفِي الْأُخْرَى سُورَةً فَوْقَهَا يُكْرَهُ، وَإِذَا قَرَأَ فِي الْأُولَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا قِرَاءَةُ الْآيَاتِ إذَا قَرَأَ فِي الْأُولَى آيَةً فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُخْرَى آيَةً مِنْ سُورَةٍ فَوْقَهَا.

(আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮)

খাজানাতুল মুফতীন কিতাবে এ বিষয়ে লিখেছেন-

وإذا قرأ في ركعةٍ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} يقرأ في الركعة الثانية {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}

(খাজানাতুল মুফতীন, পৃষ্ঠা-৪৪৯)

উক্ত কিতাবের হাশিয়ায় লিখেছেন-

حذراً من كراهة القراءة منكوسة، ولأنّ قراءة سورةً واحدة في الركعتين غير مكروه.

রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

فَإِنْ اضْطُرَّ بِأَنْ قَرَأَ فِي الْأُولَى {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} الناس: أَعَادَهَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ لَمْ يَخْتِمْ نَهْرٌ لِأَنَّ التَّكْرَارَ أَهْوَنُ مِنْ الْقِرَاءَةِ مَنْكُوسًا بَزَّازِيَّةٌ، وَأَمَّا لَوْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ يَقْرَأُ مِنْ الْبَقَرَةِ.

(হাশিয়াতু ইবন আবিদীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪৬)

কাজী আবুল কালাম আজাদ
ওসমানীনগর, সিলেট

প্রশ্ন: অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা সালাতের ভেতরেই আঙুল ফোটায় বা নখ কামড়ায়। সালাতের মধ্যে আঙুল ফোটানো ও নখ কামড়ানো যাবে কি?

জবাব: নামাযের মধ্যে আঙ্গুল ফোটানো ও নখ কামড়ানো উভয়টি মাকরূহে তাহরীমী। হাদীস শরীফে নামাযে আঙুল ফোটানো বিষয়ে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- এটি কাওমে লূতের বদভ্যাস হিসেবে পরিগণিত। তাই কেউ কেউ অপ্রয়োজনে নামাযের বাইরেও মাকরূহ বলেছেন। আবার অনেকে একে শয়তানের কুমন্ত্রনার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। চার ইমাম ও অধিকাংশ ফিকহবিদ মনীষীর অভিমত অনুযায়ী নামাযে আঙুল ফোটানো মাকরূহ। তাছাড়া কোনো এক রুকুনে তিনবার বা ততোধিক করলে তা আমলে কাসীর হিসেবে নামায ভঙ্গের কারণ হবে। ইমাম ইবন হাযামের মতে- নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে হলে তা নামায ভঙ্গের কারণ বলে বিবেচিত হবে। সুনান ইবন মাজাহ কিতাবে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ"

-হযরত হারিস (রা.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি নামাযরত অবস্থায় আঙুল ফোটাবো না। (সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৬৫)

এ সম্পর্কে আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ কিতাবে লিখেছেন-

وقال تاج الشريعة: وإنما يكره لأنه عمل قوم لوط فيكره التشبيه بهم. قلت: فعلى هذا يكره خارج الصلاة أيضا، وقال شيخ الإسلام: كره من الناس الفرقعة خارج الصلاة فإنها تلقين الشيطان، ولا خلاف لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم في كراهة فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة، وقال ابن حزم: إن

تعمد فرقعة الأصابع أو تشبيكها أو تختم في غير الخنصر فصلاته باطلة.

(আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

আন নাহরুল ফাইক কিতাবে লিখেছেন-

وكره أيضًا (فرقعة الأصابع) وهو غمزها أو مدها لتصوت للإجماع عل كراهة ذلك فيها كذا في (الدراية)

(আন নাহরুল ফাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮-২৭৯)

মো. সাইদুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক, ঘোষগাঁও সুন্নিয়া হাফিযিয়া মাদরাসা
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: বর্তমান সময়ে অনেক ব্যক্তির উমরাহ পালনের সামর্থ্য আছে কিন্তু হজ্জ করার সামর্থ্য নেই, এমন ব্যক্তিবর্গ যদি উমরাহ আদায় করে ফেলে তাহলে তাদের উপর হজ্জ আদায় করা ফরয কি না? অথবা সামর্থ্যহীন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ অন্যের সাহায্যে বা খরচে উমরাহ আদায় করে ফেলে তাহলে তার উপর হজ্জ আদায় করা ফরয কি না এবং সাউদী আরবে রুজি-রোজগার করার জন্য অবস্থানরত অন্য কোনো দেশের নাগরিকদের উপর হজ্জ আদায় করা ফরয কি না?

জবাব: হজ্জে গমনের সামর্থ্য নেই তবে উমরাহ আদায়ের সামর্থ্য আছে এমন ব্যক্তির উপর উমরাহ পালনে মক্কা শরীফ গমনের কারণে হজ্জের মাসসমূহে মক্কা শরীফে অবস্থান না করলে কিংবা হজ্জ আদায়ে কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি থাকলে হজ্জ ফরয হয় না। তবে যদি উমরাহ পালনের পর মক্কা শরীফ থাকাবস্থায় হজ্জের মাস শুরু হয়ে যায় কিংবা হজ্জের মৌসুমে উমরাহ পালনে মক্কা শরীফ গমন করে এবং উক্ত ব্যক্তির জন্য যদি হজ্জ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থানের অনুমতি ও সামর্থ্য থাকে এবং হজ্জ পালনে রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনোরূপ বাধা না থাকে তবে তার জন্য কেবল হজ্জ ফরয হবে, যদি তিনি পূর্বে কোনো ফরয হজ্জ আদায় না করেন। আর পূর্বে ফরয হজ্জ আদায় করে থাকলে, হজ্জের মাসে উমরায় গমন করলে তার পক্ষে দ্বিতীয় বার হজ্জ ফরয হবে না।

বর্তমান সময়ে সাউদী সরকারের পক্ষ থেকে উমরায় গমনকারীদেরকে সরাসরি হজ্জের অনুমতি কিংবা সুযোগ দেওয়া হয় না। আর হজ্জের অনুমোদন ব্যতীত কেউ হজ্জ করতে আরাফাহ যেতে তার বাধা থাকায় হজ্জ ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত أمن الطريق তথা রাস্তা নিরাপদ হওয়ার শর্ত পূরণ না হওয়াতে ফকীহগণ তার উপর হজ্জ ফরয হয় না বলে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটিই অধিক যৌক্তিক। আর কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে অধিক ভারসাম্যপূর্ণ মত হিসেবে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلًا

-আর বায়তুল্লাহর হজ্জ মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, যার সামর্থ্য রয়েছে এতে পৌঁছার। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯৭)

মহান আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন-

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

-আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো বিষয়ে বাধ্য করেন না। (সূরা বাকারাহ, আয়াত-২৮৬)

আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার কিতাবে লিখেছেন-

وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْنِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَى الْمَقْصُودِ دُونَهُ، وَأَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إذَا قَدَرُوا بِغَيْرِ رَاحِلَةٍ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ بِدُونِ الْمَشَقَّةِ.

হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য রাস্তা অবশ্যই নিরাপদ হতে হবে, কারণ এটি ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। আর এজন্য মক্কাবাসী এবং এর আশেপাশের লোকদের জন্য হজ্জ ফরয হয় যদি অসুবিধা ছাড়াই বিনা বাহনে হজ্জ আদায়ে সক্ষম হন। (আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪০)

অনুরূপ সামর্থ্যহীন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ অন্যের সাহায্যে বা খরচে উমরাহ আদায় করে ফেলে তাহলে উপরিউক্ত কারণে তার উপর হজ্জ আদায় করা ফরয হবে না।

তাছাড়া সাউদী আরবে রুজি-রোজগার করার জন্য অবস্থানরত অন্য কোনো দেশের নাগরিকদের উপর হজ্জ ফরয হওয়া তার সামর্থ্যের উপর এবং বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত থাকার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সেখান থেকে হজ্জ করতে যে খরচাদি প্রয়োজন সেটা থাকা এবং চাকুরির দায়িত্ব থেকে ছুটি পাওয়া ইত্যাদি। তাই কোনো বাধা ব্যতিত সামর্থ্যের অধিকারী হলে তার জন্য হজ্জ ফরয হবে।

সাইদুল ইসলাম
এম.সি কলেজ, সিলেট

প্রশ্ন: এন্ট্রি ফি দিয়ে ফুটবল খেলায় বিজয়ী হয়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাগল বা খাসি খাওয়া জায়িয কি না?

জবাব: উল্লিখিত পন্থায় উক্ত ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়িয নয় এবং এতে বিজয়ী হয়ে প্রাপ্ত ছাগল বা খাসি খাওয়া হালাল নয়, বরং ইহা জুয়া হিসেবে বিবেচিত। যদি কেউ এরূপ কিছু গ্রহণ করে নেয় তাহলে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত তা কোনো দরিদ্র লোককে সাদকাহ করে দেওয়া উচিত। কেননা উক্ত মালের মূল মালিক সনাক্ত করা সম্ভবপর নয়। উক্ত মাসআলার বিবরণে রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

(قَوْلُهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) بِأَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقَ فَرَسُك فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقَ فَرَسِي فَلِي عَلَيْك كَذَا زَيْلَعِيٌّ وَكَذَا إنْ قَالَ إنْ سَبَقَ إبِلُك أَوْ سَهْمُك إلَخْ تَتَارْخَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قِمَارًا) لِأَنَّ الْقِمَارَ مِنْ الْقَمَرِ الَّذِي يَزْدَادُ تَارَةً وَيَنْقُصُ أُخْرَى، وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَامِرَيْنِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ وَهُوَ حَرَامٌ

(রদ্দুল মুহতার; হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন আলা দুররিল মুখতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৩)

এ বিষয়ে মূলনীতি আলোচনাপূর্বক 'তাকমিলাহ ফাতহুল মুলহিম' কিতাবে লিখেছেন,

فالضابط في هذا . . . أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح مفيد في المعاش ولا المعاد حرام اور مكروه تحريماً، . . . وما كان فيه غرض ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي عنه من الكتاب أو السنة . . كان حراماً أو مكروهاً تحريماً، ... وأما مالم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي علي نوعين ، الأول ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه ومفاسده أغلب علي منافعه، وأنه من اشتغل به الهاه عن ذكر الله وحده وعن الصلاة والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه لاشتراك العلة فكان حراماً أو مكروهاً، والثاني ماليس كذالك فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح، بل قد ير تقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه ... وعلي هذا الأصل فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها مالم يشتمل علي معصية أخري، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الاخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه

(তাকমিলাহ ফাতহুল মুলহিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৫ كتاب الرؤيا)

উক্ত হারাম থেকে নিস্কৃতির উপায় সম্পর্কে রদ্দুল মুহতার কিতাবে আরো লিখেছেন-

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ عَيْنَ الْحَرَامِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ صَاحِبِهِ،

(রদ্দুল মুহতার; হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন আলা দুররিল মুখতার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৯)

আফগান নারীদেরকে হয়রান করে চলেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়

সাফিয়্যাহ



২০২১ সালে মালালা ইউসুফজাই মন্তব্য করেছিলেন,"আমি এখনো বুঝি না কেন মানুষকে বিয়ে করতে হবে" একথার মাধ্যমে এই নারী ইসলামী সংস্কৃতি ও নিয়মের প্রতি স্পষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। সম্প্রতি আফগানিস্তান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,"আমি কখনো কল্পনা করিনি যে, নারীদের অধিকার এত সহজে হরণ করা হবে।" এরপরও আফগান নারীরা কেন মালালার মতো বিয়ের দরকার নিয়ে সন্দিহান নয়?

জাতিসংঘের তথ্যানুসারে বর্তমানে ২৩.৭ মিলিয়ন আফগানী মানুষের মানবিক সহায়তার প্রয়োজন। যার মধ্যে ৯.২ মিলিয়ন শুধু শিশু। প্রতি চারজনে একজন আফগান জানে না তার পরবর্তী খাবার কোথা থেকে আসবে! সেক্ষেত্রে, নারীর অধিকার নিয়ে মালালা ইউসুফজাইয়ের মতো তথাকথিত উদ্বিগ্ন কর্মীদের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত ছিলো এসব নারীদের মারাত্মক মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আফগান নারীদের প্রকৃত সমস্যাগুলোর প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় খুব সামান্যই মনোযোগ দিচ্ছে। আফগানিস্তানের নারীরা প্রকৃতপক্ষে যেসব সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছেন, সেগুলো নিয়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় না বললেই চলে। 'ভণ্ডামি বা দ্বিচারিতা' এই অধিকার কর্মীদের একটি মৌলিক মূল্যবোধ। তারা মূলত বৃহত্তর ইসলাম বিরোধী এজেন্ডার অংশ হিসেবে কাজ করে আর এর আড়ালে নিপীড়িত নারীদের প্রকৃত দুর্ভোগ বা কষ্টগুলো স্বাভাবিকভাবে এরা এড়িয়ে যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে গাযার নারীগণ। এটা ভুলে গেলে চলবে না,আফগান নারীদের দুর্দশা আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতৃক তাদের সম্পদ জব্দকরণ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে । মানবিক সংকটের মধ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যেখানে তথাকথিত পশ্চিমা মানবাধিকার কর্মীরাই এই নারীদেরকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেখানে পশ্চিমারা কি তালেবানকে নারী অধিকার শেখানোর আদৌ কোন নৈতিক অধিকার রাখে? তাও আবার দুই দশক ধরে চলা যুদ্ধে আফগানদেরকে নিহত ও পঙ্গু করে দেয়ার পর। কেন তাহলে মালালা ইউসুফজাইয়ের মতো কর্মীরা এই হৃদয়বিদারক মানবিক দুর্ভোগের ব্যাপারে নীরব? পশ্চিমা দেশগুলোর অমানবিকতা সত্যিই হতাশাজনক,আর এসব মানবাধিকার কর্মীদের দ্বিপাক্ষিক নীতি বা ভণ্ডামি হতবাক করার মতো। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেসব নারীদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর কথা বলে,সেসব নারীদের বেশিরভাগই জানে না তাদের পরবর্তী খাবার কোথা থেকে আসবে। এ বিষয়ে তারা খুব চিন্তিত। এমনকি তারা তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে আরও বেশি উদ্বিগ্ন। তারা মূলত এসব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও ইসলাম বিরোধী তথাকথিত নারী অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের ক্রমাগত হয়রানি থেকে মুক্তি চায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়,মার্কিন বোমায় আফগানিস্তান ধ্বংস হওয়ার মুহূর্তে এসব এজেন্ডা চুপ ছিলো কিন্তু নারীদেরকে ইসলাম থেকে বের করার জন্য আফগানিস্তানীদের প্রতি তারা যত্নশীল হওয়ার ভান করে। যদি সত্যিই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আফগান নারীদের কল্যাণ চায়,তাহলে তাদের উচিত আফগানীদের অর্থনৈতিক সমস্যার মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগী হওয়া এবং অযথা নারী অধিকারের নামে আফগান সমাজে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন না চালিয়ে বরং নারীদের আসল সমস্যাগুলো মুকাবিলায় ইসলামী ইমারাত যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার প্রশংসা করা। আফগানিস্তানের দাওয়াহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Promotion of Virtue and Prevention of Vice) সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে,যেখানে ইসলামী ইমারাত নারী অধিকার রক্ষায় কী কী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী ইমারাত যেখানে মাঠ পর্যায়ে নারীদের পরিস্থিতি উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেখানে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো গত তিন বছর ধরে নারী অধিকার নিয়ে মায়াকান্না দেখিয়েছে। ইসলামী ইমারাত অগ্রহণযোগ্য সাংস্কৃতিক চর্চার বিপরীতে গত তিন বছরে প্রায় ২০,০০০ নারীর মৌলিক অধিকার রক্ষা, উত্তরাধিকার, দেনমোহর এবং ৫,০০০ জোরপূর্বক বিয়ে বন্ধ করেছে। গত ছয় মাসে প্রায় ১,০০০ পারিবারিক নির্যাতনের মামলা নিষ্পত্তি করেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও পশ্চিমা নারী অধিকার কর্মীদের উচিত নারী দুর্ভোগ নিরসনে ইসলামী ইমারাতের এই প্রচেষ্টা থেকে শিক্ষা নেওয়া। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে,এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্ভাবনাময় পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য ইসলামী ইমারাতের সঙ্গে সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে এইসব অধিকার কর্মীরা এমন অকেজো পথ বেছে নিয়েছে, যা আফগান নারীদের কোনোরকম কেনো উপকারই করে না। বরং শুধুমাত্র তাদের ইসলাম বিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নেই সহযোগিতা করে।

[Islamic emirate of Afghanistan -ওয়েব সাইট থেকে মাসিক পরওয়ানার পাঠকদের জন্য ভাষান্তর করেছেন মুহাম্মাদ সাঈদ-বিভাগীয় সম্পাদক]

ঘরোয়া

ফৌজিয়া সুলতানা জুঁই

বাংলাদেশে শীতকাল চলে এসেছে। শীতকালে অন্যান্য অনেক সমস্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে পায়ের গোড়ালি (Ankle) ফাটা সমস্যা। নারী-পুরুষ উভয়েই এই সমস্যায় পড়তে পারেন। অনেকেরই পায়ের পাতার গোড়ালির দিকের নিচের অংশ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। শুষ্ক আবহাওয়া এবং পায়ের পাতার যে অংশে চাপ বেশি পড়ে সেই অংশ ফেটে যায়। এই পা ফাটার ব্যথা যে কী পরিমাণ ভয়াবহ হতে পারে, সেটা যার পা ফাটে সে ছাড়া কারো বোঝার উপায় নেই। এই পা ফাটা নিরাময় করতে অনেকেই অনেক ধরনের ক্রিম ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কেমিক্যাল সমৃদ্ধ ক্রিমে প্রাথমিকভাবে পা ফাটা কিছুটা ঠিক হলেও পরবর্তীতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াসহ আবার সমস্যা শুরু হয়। তাই আজকে আপনাদের জানাবো সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে পা ফাটা রোধের ৩টি সহজ উপায়।

(১) গ্লিসারিন ও গোলাপ জলের ফুট মাস্ক:

পায়ের গোড়ালি ফাটা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে, তাহলে আপনি অনায়েসে এটি ফুট মাস্ক (Foot mask) ব্যবহার করে দূর করতে পারেন।

পদ্ধতি: ফুট মাস্কের জন্য আপনার লাগবে লবণ, লেবুর রস, গ্লিসারিন, গোলাপজল (Rose water) ও কুসুম গরম পানি। একটি বড় পাত্রে ২ লিটার কুসুম গরম পানি নিয়ে তাতে ১ চা চামচ লবণ (Salt) ১ টি গোটা লেবুর রস ও ১ কাপ গোলাপজল দিয়ে এতে ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর একটি মাজুনি কিংবা পামিস স্টোন (Pumice Stone) অর্থাৎ ঝামা-পাথর দিয়ে পায়ের গোড়ালি ভালো করে ঘষে শক্ত, মোটা ও মরা চামড়া তুলে পা ধুয়ে ফেলুন। এরপর ১ চা চামচ লেবুর রস, ১ চা চামচ গ্লিসারিন ও ১ চা চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে পায়ে লাগান। এভাবে সারা রাত রেখে দিন। একটু চিটচিটে লাগতে পারে কিন্তু আপনাকে সহ্য করে নিতে হবে। সকালে উঠে কুসুম গরম পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২/৩ বার এটা ব্যবহার করলে ১০-১৫ দিনের মধ্যেই পা ফাটা গায়েব হয়ে যাবে।

(২) নারকেল ও কলার ফুট মাস্ক:

যদি পা ফাটা একটু বেশি খারাপ পর্যায়ে চলে যায় তাহলে এই ফুট মাস্কটি আজকে থেকেই প্রতিদিন ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

পদ্ধতি: একটি কলা টুকরো করে নিন। এরপর তাজা ৩/৪ খণ্ড নারকেল নিন। দুটিকে একসাথে ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর এই মিশ্রণটি পায়ের গোড়ালিতে লাগান। বিশেষ করে ফাটা স্থানে ভালো করে লাগাবেন। শুকিয়ে উঠলে কুসুম গরম পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলুন। যদি হাতের কাছে তাজা নারকেল না পান তবে একটি কলা পিষে নিয়ে এতে ২/৩ চা চামচ নারকেল তেল দিয়ে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে লাগাতে পারেন।

(৩) প্রাকৃতিক স্ক্রাব ও তেল:

পা ফাটা রোধে সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক স্ক্রাবের ব্যবহার। ঘরোয়াভাবে তৈরি এই স্ক্রাবটি প্রতিদিন ব্যবহার করে খুব দ্রুত পা ফাটা (Cracked legs) রোধ করতে পারবেন।

পদ্ধতি: স্ক্রাবটি তৈরি করতে আপনার লাগবে ২/৩ চা চামচ চাল, সাদা ভিনেগার ও মধু। প্রথমে চাল একটু ভিজিয়ে রেখে পিষে নিন। ব্লেন্ডারে দিয়ে অথবা শিল পাটায় বেটে নিতে পারেন। একটু দানা দানা করে চাল পিষে নেবেন। এরপর এতে পরিমাণ মত ভিনেগার ও মধু দিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। একটি বড় পাত্রে কুসুম গরম পানিতে ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ভেজা পায়ে ঘন পেস্টটি ভালো করে ম্যাসাজ করুন। ম্যাসাজ করে পা সেভাবেই রেখে দিন ১০ মিনিট। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ভালো করে মুছে নিন। তারপর খানিকটা অলিভ অয়েল (Olive oil) গরম করে নিয়ে পায়ে ম্যাসাজ করুন। সপ্তাহে ২/৩ বার ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

ঠান্ডাজনিত রোগ এড়াতে প্রাচীনকাল থেকেই ভেষজ সমাধান ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসব পদ্ধতি প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য হওয়ায় শরীরে তেমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই কার্যকর হয়। আসুন কিছু ভেষজ সমাধান জেনে নিই, যা সহজে প্রস্তুত করা যায় এবং নিয়মিত ব্যবহারে শীতকালে ঠান্ডাজনিত রোগ এড়াতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

(১) আদা ও মধুর চা:

পদ্ধতি: গরম পানিতে ১চা চামচ আদা কুচি দিয়ে ৫ মিনিট ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। এরপর ১চা চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন।

উপকারিতা: সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথা দূর করে। শরীর উষ্ণ রাখে।

(২) তুলসী পাতার রস:

পদ্ধতি: কয়েকটি তাজা তুলসী পাতা পানিতে ফুটিয়ে পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে পান করুন।

উপকারিতা: শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ কমে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

(৩) গোলমরিচ ও মধুর মিশ্রণ:

পদ্ধতি: আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া ও ১ চা চামচ মধুর মিশ্রণ দিনে ২-৩ বার খান।

উপকারিতা: সর্দি ও কাশির জন্য খুব কার্যকর।

(৪) লবঙ্গ ও তুলসী চা:

পদ্ধতি: ২-৩টি লবঙ্গ, কয়েকটি তুলসী পাতা গরম পানিতে ফুটিয়ে চায়ের মতো পান করুন।

উপকারিতা: গলা ব্যথা এবং সর্দি উপশম করে।

(৫) মেথি ও মধু পানীয়:

পদ্ধতি: গরম পানিতে মেথি ফুটিয়ে ১ চা চামচ মেথি গুঁড়া ও ১ চা চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন।

উপকারিতা: সর্দি-কাশি ও কফ নিরাময় করে।

(৬) গরম পানিতে লবণ গার্গল:

পদ্ধতি: এক গ্লাস গরম পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে গার্গল করুন।

উপকারিতা: গলা ব্যথা ও জীবাণু দূর করে।

(৭) ভাপ নেওয়া:

পদ্ধতি: গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল দিয়ে ভাপ নিন।

উপকারিতা: নাক বন্ধ ও শ্বাসকষ্ট কমায়।

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক

মহাকাশের বিস্ময়কর গর্ত

ব্ল্যাকহোল (Black Hole) শব্দটির অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণগহ্বর। এটি মহাকাশের অত্যন্ত বিস্ময়কর একটি জায়গা, যার মধ্যাকর্ষণ শক্তি মারাত্মক প্রখর। জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি অনুসারে, কৃষ্ণগহ্বর মহাকাশের এমন একটি বিশেষ স্থান যেখান থেকে কোন কিছুই বের হয়ে আসতে পারে না। এমনকি সর্বোচ্চ গতি সম্পন্ন আলোও নয়! আলোকতরঙ্গ মহাকাশীয় এই গহ্বরের কাছে এসে পথ হারায়। এর নাম গহ্বর হলেও আসলে এটা ফাঁকা নয় বরং এর ভেতরে প্রচুর পরিমাণ পদার্থ জমাট বেঁধে আছে। মহাবিশ্বে এমন কিছু তারকা বা নক্ষত্র আছে, যারা এত শক্তিশালী মহাকর্ষ বল তৈরি করে যে, এটি তার কাছাকাছি চলে আসা যেকোন বস্তু অর্থাৎ গ্রহ, ধুমকেতু বা স্পেসক্রাফট ইত্যাদিকে কাছে টেনে নেয়। অস্বাভাবিক আকার, ভর ও ঘনত্বের কারণে এই তারকাদের থেকে নির্গত আলো বাইরে আসতে পারে না। আরও সহজ ভাষায় বললে– যখন একটি তারকার জীবনকাল শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট জ্বালানি শেষ হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে তারকাটির অভিকর্ষ শক্তি এতই প্রবল হয় যে, আলো ওখান থেকে বের হতে পারে না। আর তা থেকেই জন্ম হয় একটি গর্তের। ১৯৬৭ সালে আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার এর নাম দেন 'ব্ল্যাকহোল'। মোদ্দাকথা হলো, একটি তারকার মৃত্যু থেকে জন্ম নেয় একটি ব্ল্যাকহোল। ব্ল্যাকহোলের আকার ছোট হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্ষুদ্রতম ব্ল্যাকহোল একটি পরমাণুর সমান হলেও তাদের এক একটার ভর হতে পারে বিশাল কোন পর্বতের সমান। আবার কোনো কোনো ব্ল্যাকহোলের ভর সূর্যের সমান হতে পারে। ভরের উপর ভিত্তি করে ব্ল্যাকহোল চার ধরনের হয়। যেমন ১) Super Massive Black Hole (সুপার মেসিভ ব্ল্যাকহোল) ২) Intermediate Black Hole (ইন্টারমিডিয়েট ব্ল্যাকহোল) ৩) Micro Black Hole (মাইক্রো ব্ল্যাকহোল) ৪)Steller Black Hole (স্টেলার ব্ল্যাকহোল)। ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এসব ব্ল্যাকহোলের ছবি পাওয়া যায়। আলোর মতো গতিসম্পন্ন বস্তু গিলে খাওয়া এই মহাকাশীয় ব্ল্যাকহোল নামক দানবকে নিয়ে আজও কৌতূহলের শেষ নেই। ব্ল্যাকহোল নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখনো চলমান।

মানুষের ডিএনএর কাজ কী?

মানুষের জীবনের জৈবিক নকশা হলো ডিএনএ, Deoxyribouncleic acid (DNA) যেখানে শরীরের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের তথ্য বিদ্যমান। ডিএনএ দেখতে অনেকটা পেঁচানো সিঁড়ির মতো। যার গঠনতন্ত্রকে ডাবল হেলিক্স (Double Helix) বলা হয়। ডিএনএ মূলত চার ধরনের নিউক্লিওটাইড যথা–১) অ্যাডেনিন-এ (Adenine - A), ২) গুয়ানিন-জি (Guanine - G), ৩) থাইমিন-টি (Thymine - T), এবং ৪) সাইটোসিন-সি (Cytosine - C) দিয়ে গঠিত, এই চার নিউক্লিওটাইড পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট উপায়ে যুক্ত হয়ে ডিএনএ-র গঠন তৈরি করে। প্রতিটি ডিএনএ'র দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মিটার এবং অণু ডাবল-হেলিক্স দ্বারা গঠনযুক্ত। মানুষের শরীরে ৩৭ ট্রিলিয়ন কোষ আছে। প্রতিটি কোষের ডিএনএ একসঙ্গে জোড়া দিলে তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৩৪ বিলিয়ন মাইল। ডিএনএর প্রধান কাজ হলো আমাদের দেহের সমস্ত জিনগত তথ্য সংরক্ষণ করা এবং তা সঠিক সময়ে ব্যবহার করা। ডিএনএর কোডে বিভিন্ন প্রোটিন তৈরির নির্দেশনা থাকে, যা দেহের বিভিন্ন অংশ তৈরি করতে সহায়তা করে। প্রোটিন হলো আমাদের দেহের ভিত্তি। এই প্রোটিনগুলো দেহের বিভিন্ন কোষের কাজ পরিচালনা করে, যেমন– কোষের বিভাজন, ক্ষতি মেরামত করা এবং নতুন কোষ তৈরি করা। এছাড়াও, ডিএনএর কাজ হলো উত্তরাধিকারসূত্রে জিনগত তথ্য পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর করা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে, যা একে অন্যদের থেকে আলাদা করে। ডিএনএ টেস্ট করার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। জিনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করতে ডিএনএ টেস্ট এর বিকল্প নেই। তাই অনেক সময় পিতৃত্ব পরীক্ষা, মাতৃত্ব পরীক্ষা, অথবা ভাইবোনের সম্পর্ক নির্ধারণে ডিএনএ টেস্ট করা হয়। এর জন্য (Sample) বা নমুনাস্বরূপ সাধারণত মানুষের শরীরের রক্ত, থুতু অথবা চুলের মূল ব্যবহার করা হয়। এসব নমুনা ল্যাবরেটরিতে প্রক্রিয়াকরণ করে ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে ডিএনএ টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা নমুনা ব্যবহার করে ডিএনএ টেস্ট-এর মাধ্যমে সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে

"ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

অফিস: ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা, ৩৩৪/৪এ, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

অভ্যন্তরীণ

ঘটনাবহুল ২০২৪ সাল শেষ হলো। এক অভ্যুত্থানে পতন হয়েছে দেড় দশকেরও বেশি সময় বাংলাদেশ শাসন করা দল আওয়ামী লীগের। এ ঘটনায় দেশে সামগ্রিক পরিবর্তনের একটি প্রত্যাশা নিয়ে আশাবাদী হন সাধারণ জনগণ। যদিও দেশের অর্থনীতিতে এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসেনি বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত । জনজীবনে স্বস্তি আসার মতো কোনো পরিবর্তন আসেনি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও উন্নতিও দৃশ্যমান নয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ৫ আগস্টের পর চার মাসে সারা দেশে ১৩৬১ খুন, ২৫৫টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। স্থিতিশীলতা ফেরেনি রাজনীতিতেও। বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে তাই বিশেষজ্ঞরা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা হিসাব-নিকাশ কষছেন।

নানাদিক দিয়ে বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরও ছিলো ঘটনাবহুল। বিগত বছরগুলোর পরিচিত একটি চিত্র ছিলো, পহেলা জানুয়ারিতে বই উৎসব হতো দেশজুড়ে। বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে পৌঁছে যেত নতুন বই। শিক্ষার্থীরা নতুন বইয়ের ঘ্রাণে মাতোয়ারা হতেন।কিন্তু গত ৯ ডিসেম্বর নতুন করে বইয়ের টেন্ডার ও সংস্কারের কারণে বিগত বছরগুলোর মতো পহেলা জানুয়ারি বই উৎসব হবে না বলে জানিয়ে দেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। তবে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এ বিষয়ে তার বক্তব্য ছিলো, একটি দেশকে বই ছাপানোর জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে। নতুন বইয়ে বেশ কিছু সংস্কার ও সংযোজন করা হচ্ছে। যে কারণে বই ছাপাতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। অনেকেই এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, কেননা বই উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছিলো বিগত বছরগুলোতে। আবার অনেকে হতাশাও প্রকাশ করেছেন এজন্য যে, বছরের শুরুতেই বই হাতে পাওয়ায় পড়াশোনার একটি আবহ সৃষ্টি হয়। তবে সরকার সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে তাদের পড়াশোনামুখী করবে বলেই সকলের আশাবাদ।

এরইমধ্যে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ে ভয়াবহ আগুনের খবরে দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বড়দিনের ছুটির দিন গত ২৫ ডিসেম্বর, বুধবার গভীর রাতে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগে। এতে এই ভবনে থাকা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কক্ষগুলো পুড়ে যায়। দেয়াল ও মেঝেতেও বড় ক্ষতি হয়। অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনার কারণ বের করতে গঠিত কমিটির প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন বলা হয়, আগুনের সূত্রপাত হয় বৈদ্যুতিক স্পার্ক (স্ফুলিঙ্গ) থেকে। সাধারণত সকেট-প্লাগে লুজ কানেকশন (দুর্বল সংযোগ), কেব্‌লে ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ ইত্যাদি কারণে বৈদ্যুতিক স্পার্ক হয়ে থাকে। এই ঘটনায় কোনো বিস্ফোরকের উপস্থিতি শনাক্ত করা যায়নি। ভবনে কোনো ধরনের ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম না থাকায় প্রাথমিক ও বিকশিত অবস্থায় আগুন শনাক্ত করা যায়নি বলে তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে জানায়। এছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিশেষজ্ঞ দলের পর্যবেক্ষণে ভবনের লিফট ও সিঁড়ির অপরিকল্পিত নকশার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। সচিবালয়ের মতো দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আগুন লাগার ঘটনা দেশের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র কি না, সেটা নিয়েও জনমনে ব্যাপক জিজ্ঞাসার তৈরি হয়েছে । ভূরাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হওয়ায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সেজন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন কিছু সন্দেহজনক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে নিছক দূর্ঘটনা বলে মনে হলেও এর নিগূঢ় একটি ভিন্নার্থ থেকে যায়। সচিবালয়ের ঘটনা এ ধরনের সূদুরপ্রসারী কোনও পদক্ষেপের অংশ কি না, তা হয়তো সময়ই বলে দেবে। এ ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে তখনই, যখন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গত ৩০ ডিসেম্বর টেকনাফ সফরের প্রাক্কালে ওইদিনই টেকনাফের জাদিমুড়া এলাকায় পাহাড় থেকে ১৭ বনকর্মীকে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে। এর পরবর্তীতে আরও ৯ জনকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। তাদেরকে উদ্ধার করা গেলেও রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সফরের প্রাক্কালে এ ধরনের বড় ঘটনা ভিন্ন কিছুরই ইঙ্গিত কি না, তা নিয়ে সচেতন মহলে কৌতুহল তৈরি হয়েছে।

এদিকে গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণের সময় ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তবে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করা হয়, তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে বলেও তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান। তাঁর এ বক্তব্যঘিরেও নানা কৌতুহল দেখা গেছে। তাঁর ঘোষণার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কি আদৌ ঘোষিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে নাকি হবে না, এটি নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

দেশের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়েই নতুন বছর এসেছে। সরকার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা, বড় বড় রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে ছাত্র-জনতার সঙ্গেও সমঝোতার মাধ্যমে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলা নতুন বছরের প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা। তবে সকল চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করে দেশে শান্তির সুবাতাস বইবে, এটাই দেশের আপামর জনতার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত চাওয়া।

ঘটনাবহুল ২০২৪ সাল আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে।এই বৎসরে শেষ মাসে মুসলিম বিশ্বের ভালো কিছু অর্জন থাকলেও বছরের শেষ দিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপর ইসরায়েলের বর্বতা অব্যাহত ছিলো। ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহে ফিলিস্থিনের শেষ হাসপালটিও বর্বর ইসরায়েল বাহিনীর হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাযায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা চলছে। ফিলিস্তিনী স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস-নিয়ন্ত্রিত গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় উপত্যকায় ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৪৫ হাজার ২৮ ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন এক লাখ ছয় হাজার ৯৬২ জন।

একদিকে যখন গ্রেটার শাম অঞ্চলের এক অংশে এমন বর্বতা চলছে তখন সিরিয়ায় সমাপ্ত হলো দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দিকালের আসাদ শাহী যুলমের অবসান।এ বছরের ৮ ডিসেম্বর সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল আসাদ সরকারের পতন ঘটে। এর মাধ্যমে আসাদের দীর্ঘ ২৪ বছরের এবং ১৯৭১ সালে শুরু হওয়া আসাদ পরিবারের দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দিকালের শাসনের সমাপ্তি ঘটে। ওইদিন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ দেশ ছেড়ে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। আসাদের দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরপর সরকারি কারাগারগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করতে থাকেন মুজাহিদরা। ২০১১ সাল থেকে চলা গৃহযুদ্ধের সময় বন্দিশিবিরগুলোতে হাজার হাজার মানুষকে আটকে রাখে সরকারি বাহিনী । মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, এসব বন্দিশিবিরে আটক লোকজনকে নির্যাতন করা ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এদিকে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, আসাদ সরকারের পতনের পর ১৫ দিনে তুরুস্ক থেকে সিরিয়ায় ফিরে আসা মানুষের সংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আঙ্কারা সিরিয়ার নতুন নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করছে। তুরস্ক এখন সিরিয়ার শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করছে। দেশটি আশা করছে, দামেস্কে ক্ষমতার পরিবর্তন তাদের অনেককে দেশে ফিরতে অনুপ্রাণিত করবে।

...

এদিকে গত মাসে চীন ও আফগানিস্তানের মধ্যে সরাসরি মালবাহী ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। প্রথম যাত্রায়, চীনের জিয়াংশু প্রদেশের নান্টং শহর থেকে ৫৫টি কন্টেইনার বোঝাই একটি ট্রেন আফগানিস্তানের হাইরাতান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই ট্রেনটি কাজাকস্তান ও উজবেকিস্তান হয়ে প্রায় ২০ দিনের মধ্যে হাইরাতান বন্দরে পৌঁছে। এই ট্রেনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পণ্য-সরঞ্জাম ও অন্যান্য কাঁচামাল আফগানিস্তানে সরবরাহ করা হয়, যা দেশটির পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। চীন আশা করছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে আফগানিস্তানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিসর বাড়বে।এছাড়া, এই ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরুর মাধ্যমে সিল্ক রোডের আওতাভুক্ত রুটে মালবাহী ট্রেনের চলাচল আরও সহজ ও দ্রুত হবে, যা আফগানিস্তান ও চীন উভয়ের জন্যই লাভজনক।

...

গেল এক বছর ধরে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা চলছে। সেই আগুনে ঘি ঢেলেছে ওয়াশিংটন পোষ্ট। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে মার্কিন গণমাধ্যমটি। বলা হচ্ছে, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেছিল 'র'।

মালদ্বীপের পার্লামেন্ট সদস্য, সামরিক কর্মকর্তা এবং পুলিশ সদস্যদের ঘুষ দিয়ে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনের চেষ্টা চালানোর পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাটি জড়িত ছিল বলে উল্লেখ করা হয় ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে।

এতে বলা হয়, মালদ্বীপে চীনের প্রভাব কমাতে ভারতের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মুইজ্জুকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনায় স্থানীয় বিরোধী নেতাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ শুরু করে। মূল লক্ষ্য ছিল মুইজ্জুর প্রশাসনকে দুর্বল করে দেশটিতে ভারতপন্থি রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করা।

প্রতিবেদন মতে, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে মালদ্বীপের বিরোধী রাজনীতিকরা একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। এতে পার্লামেন্ট সদস্য, সামরিক কর্মকর্তা এবং পুলিশ সদস্যদের ঘুষ দিয়ে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনের প্রস্তাব দেয়া হয়।

অভিযোগ রয়েছে, এই প্রক্রিয়ার জন্য ৬০ লাখ ডলারের একটি বাজেট নির্ধারিত হয়। ভারতের কাছ থেকে এ তহবিল আসার কথা ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মালদ্বীপের রাজনৈতিক অস্থিরতার পেছনে ভারত এবং চীনের কৌশলগত প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে ভারত সেখানে চীনের সামরিক উপস্থিতি নিয়ে শঙ্কিত। চীনপন্থি মুইজ্জুর প্রশাসনের মাধ্যমে এই দ্বীপ রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা ভারতকে আরও সক্রিয় করে তোলে।

যদিও প্রতিবেদনে বলা হয়, মুইজ্জুকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বিষয়টি ভারত-চীন সম্পর্কের চলমান প্রতিযোগিতার একটি উদাহরণ হিসেবে বিশ্ব রাজনীতিতে আলোচিত হচ্ছে। এ ঘটনায় নতুন মাত্রা পেয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা।

...

গত ৫ আগস্টের পর থেকেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একের পর এক খবর প্রচার করে যাচ্ছে ভারতীয় গণমাধ্যম। বাংলাদেশের হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির পর থেকে তা বাড়াবাড়ি রকম পর্যায়ে চলে গেছে।এর মধ্যে বেশি সংখ্যক খবরই ভুয়া বলে জানিয়েছে ফ্যাক্ট চেক বা তথ্য যাচাই সংস্থা রিউমর স্ক্যানার।

বিবিসি বাংলা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, আওয়ামী সরকারের পতন এবং হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তারের পর থেকে এক ধরনের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব বিরাজ করছে ভারতের মূলধারার গণমাধ্যমলোতে । সেখানে প্রতিবেদনের ভাষা, উপস্থাপনা এবং তথ্য যাচাই না করেই তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভুয়া খবরও ছড়াচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। আবার সেগুলোই স্থান পাচ্ছে ভারতের নানা খবরের কাগজ-টিভিতে।

গণমাধ্যমের একাধিক বিশ্লেষক বলছেন, শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের গণমাধ্যমে একটা বিরোধিতার সুর দেখা যাচ্ছিল। তবে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির পরে তা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ভাষণ, কাগজ-টিভির প্রতিবেদন এবং সামাজিক মাধ্যম– সব মিলিয়ে যে আখ্যান তৈরি করা হচ্ছে ভারতে, তা দেশটির হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে ফেলছেন।

কবিতা

বাংলার রূমী
সৈয়দ শামসুল হুদা

তোমার কবিতা পড়ি কবি কলন্দর
আলোর দোলায় দোলে সারা অন্তর ।
ঝরো ঝরো ধারে ঝরে জান্নাতী ফুল
জাগায় জীবনাতীত স্বপ্ন আকুল।
প্রতিটি অক্ষর তার অনুরাগে ঝরা
প্রিয় নবীজির প্রেমে পাগল করা।
বিমোহিত অনুভবে খোদার দীদার
বাড়ায় চাতক তৃষা মরু সাহারার।
বিরহের আরশিতে জীবনের তীরে
মিলনের খেয়াখানি দেখি এসে ভীড়ে।
দেখি চেয়ে উন্মুখ সাতটি আকাশ
বিগলিত আঁখি জলে কী দিব্য প্রকাশ!
ভাষার আড়াল ভেঙ্গে দেখি চেয়ে তুমি
প্রেমিক জনের প্রিয় বাংলার রূমী।

লতিফনামা
আবদুল হাই শিকদার

শাহজালালের পয়গাম তিনি শাহ কামালের বাতিঘর,
দিশাহীন ঢেউয়ে পারের হদিস বেদনায় তিনি সদুত্তর।
পতিত ভূমিতে সবুজ সুষমা সুরমাকে করে প্রাণবান–
ফুলতলী থেকে ফুলের সুবাস ছড়ায় নূরের মহাসন্তান।

তাঁর খানকায় কাবার কবিতা মদীনার সব মধুরতা,
আলখেল্লায় তারার তোরণ জান্নাতী পাখি স্নিগ্ধতা।

তিনি হাসলেই চাঁদ উঠে আসে, জোছনায় ভাসে জনপদ,
অবয়বে তাঁর আল কাওসার, স্বর্ণকমল দুইপদ।

খোশ নসীবের মালিক সেইই যে রেখেছে তাঁর দু'হাতে হাত-
মলিন মর্ম মুছে গেছে দ্রুত, এসেছে খিলানে নব প্রভাত।

মুনতাখাবুস সিয়রের পাশে তাঁর তানভীর সে তাফসীর
ব্যথিত জনের ধ্যানের আকাশে আনে উদ্ধার তৌহিদী তীর।
সূর্য তিনি মানবকুলের, যুগের শ্রেষ্ঠ আল্লামা
তাঁর নাম ছুঁয়ে হোক বরেণ্য আমার এ ক্ষুদ্র 'লতিফনামা'।



মক্তব স্মৃতি

মুহাম্মাদ উসমান গণি

শীতের সকাল। ঘন কুয়াশায় মাঠঘাট ঢাকা। গ্রামের মেঠো পথ। পথের দুই ধারে সবুজ ঘাস। ফযরের নামায পড়ে এই পথ ধরে হাঁটাহাঁটি করতেন ইমাম মুসলিহুদ্দীন শাইখ সাদী রাহিমাহুল্লাহ। শিশির ভেজা ঘাসের উপর পা ভিজিয়ে ভিজিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। পথিমধ্যে



দূরে কোথাও বাচ্চাদের কিচির মিচির শুনতে পেয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি পৌঁছে একটি মক্তব আবিষ্কার করেন। দেখলেন একজন উস্তায কিছুসংখ্যক শিশুদের কুরআন পড়াচ্ছেন। তিনি দেখলেন মক্তবের শিক্ষক যিনি চরম বদমেজাজী, কর্কশভাষী, আর কঠোর প্রকৃতির। তার মুখের দিকে তাকালে মন বিরক্তিতে ভরে উঠে, আলাপ করা তো দূরের কথা, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার আগ্রহই হারিয়ে ফেলেন । মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। তার গুমরো মুখ দেখে তিনি খুব বিরক্ত হলেন। এদিকে কোমলমতি নিষ্পাপ শিশুরা তার নির্মম নির্যাতনের ভয়ে খুব সন্ত্রস্ত। কোন ছাত্র এদিক ওদিকে তাকানোর কোন সুযোগ নেই। কেউ একটু মুচকি হাসবে বা একটা শব্দ করবে, তার জো ছিল না। কারণ শিক্ষকটির মুখে তর্জন-গর্জন লেগেই থাকত। আর তার হাত দুটি কারো কোমল মুখে চড়, কারো পিঠে বেত্রাঘাত অথবা কারো কান ধরে সজোরে মুচড়ে দেওয়া- প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকত। আর বেত্রাঘাততো আছেই। তার অত্যাচারে পুরো মক্তবটি যেন হয়ে উঠেছিল একটা বিভীষিকাময় কারাগার। এমন দৃশ্য কবির কঠিনমনে বড় বেদনাদায়ক মালূম হলো। তিনি ভাবলেন এরকম কর্কশ মেজাজীর হাত থেকে এই নিষ্পাপ শিশুগুলোকে মুক্তি দেওয়া উচিত । শিশুগুলোকে হাসিখুশি আর আনন্দ-উল্লাস করতে দেওয়া উচিত। তিনি খুব ভাবছেন বিষয়টি নিয়ে। সে চিন্তা নিয়ে তিনি গ্রামে বিচরণ করছেন। কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠকে পেয়েও গেলেন। তাদেরকে এই অত্যাচারী শিক্ষককে অপসারনের পরামর্শ দেন। কবির পরামর্শ কাজেও দিলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই আলোচিত শিক্ষককে মক্তবের শিক্ষকতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তার স্থলে অন্য একজন ভালো শিক্ষক নিযুক্ত করা হলো।

শাইখ সাদী বলেন, এ খবর শুনে স্বভাবতই ভারী খুশি হলাম। সাথে নতুন শিক্ষককে দেখতে ওই মক্তবে হাযির হলাম। নতুন শিক্ষকটি ছিলেন আগের শিক্ষকের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। তিনি ছিলেন সরল স্বভাব, স্পষ্টভাষী, মধুর ব্যবহার, বিনয়ী ও মিশুক প্রকৃতির। বেহুদা কথা বলেন না কারো মনে ব্যথা পায় এমন কাজও করেন না । ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুত্রের মতো স্নেহ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের মন থেকে শিক্ষক ভীতি উধাও হয়ে গেল। এবং উস্তাযের ভদ্র স্বভাবের সুযোগে ছাত্রদের মধ্যে ধীরে ধীরে চাঞ্চল্য ফিরে আসতে লাগলো, দৈত্যসুলভ স্বভাব দেখা দিতে লাগল। একদল খেলাধুলায় মেতে উঠল আরেক দল অপরের মাথায় শ্লেট ভেঙে মারামারি শুরু করে দিল। শিক্ষক কোনো শাসন না করায় ছাত্ররা নতুন পড়ালেখা তো ছেড়েই দিল অধিকন্তু পুরোনো পড়াগুলোও বেমালুম ভুলে যেতে লাগলো। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে, মক্তব আর মক্তব রইল না। মারামারি ও খেলার আড্ডায় পরিণত হয়ে গেলো।

শাইখ সাদী বলেন, আমি কয়েক সপ্তাহ পর আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি সেই সাবেক শিক্ষক আবার সগৌরবে তার সাবেক আসন দখল করে জেঁকে বসেছেন। তার দুর্দান্ত প্রতাপে মক্তব গৃহ নীরব, নিস্তব্ধ। ভয়ে ভয়ে সবাই নিজ নিজ পড়া মুখস্ত করতে ব্যস্ত। মাঝেমধ্যে বড় আওয়াজ যা হয় তাও উস্তাযের ইশারায় যৌথ কন্ঠে কোন দুআ কালাম পড়ার সময়। এ অবস্থা দেখে ক্ষোভ ও বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল। বললাম, আবার কেন ইবলিশকে ফিরিশতাদের উস্তায বানানো হয়েছে? একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী বৃদ্ধ আমার কথা শুনে হেসে দিয়ে বললেন: মা-বাবার স্নেহ চুম্বনের চেয়ে উস্তাযের বেত্রাঘাত উত্তম। শুনেননি?

কবি তখন নিম্নোক্ত কথাগুলো মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে প্রস্থান করলেন-

এক রাজা দিয়েছিল পুত্রকে স্কুলে
সোনার প্লেট কিনে দিল তার কোলে
সোনার হরফে লেখা ছিল পাশে তার
পিতৃ স্নেহ হতে ভালো গুরুর অত্যাচার।

স্মরণ
মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

এই দেশ এই মাটি এই পৃথিবী
ভুলবে না ফুলতলী নায়িবে নবী।

কুরআনের খিদমতে স্মরণীয় তুমি
আহমদ হিজাযীর আমানত তুমি
আলোকিত জনগণ আলোকিত ভূমি
বহুমুখী অবদানে মুগ্ধ যে সবি।

সহীহ আকীদার তরে লহু করে দান
বদ আকীদার ভুল করে অবসান
চালালে মিশন তব বাজি রেখে প্রাণ
তুমি-ই দেখালে ফের বালাকোট ছবি।

মসজিদ মাদরাসা খানকার পীর
হুংকারে মাঠ কাঁপে, কাঁপে রণ বীর
শরীআতে তরীকতে উঁচু তব শির
রূমী জানি বাংলার কলন্দর কবি।

শয়নে স্বপনে সদা জীবনে মরণে
থাকি যেন এ অধম তোমার স্মরণে
বিনীত মিনতি ওগো চরণে তোমার
ভয়াল নিদানে যেন ফয়েয লভি।

দেশটা সবার আগে
আলিম উদ্দিন আলম

দুই পাশের দুই রুমে
আগুন কেন লাগে?
এমন নযীর এই জীবনে
দেখিনি তো আগে।

সচিবালয়ে যদি হয়
ভয়ংকর এই দৃশ্য
সরকারের এই দুর্বলতায়
দেশটা হবে নিঃস্ব।

অপরাধ যেই করুক
ছাড় যেন নাহি পায়
আগুন আর জ্বালিও না
শান্তিপ্রিয় দেশটায়।

দেশটা আমার দেশটা তোমার
দেশটা সবার আগে
স্বাধীন দেশের করুণ চিত্র
কলিজাতে লাগে।

হারিয়ে তোমায়
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

০১
পড়লো খসে যমীন থেকে
আলোর জ্যোতি হেরার
যাঁর বয়ানে শুনতাম সব
তারিফ মোস্তাফার।

ইশকে নবীর শুনিয়ে বয়ান
করতে ঈমান তাজা
জ্বালিয়ে দিতেন কলবে ঈমান
নবীজীর রওয়াযা।

০২.
লক্ষ আশিক আসবে যাবে
বালাই হাওর সাজবে ঠিক
কী বিরহের শূন্যতাতে
ঘিরবে সেদিন চতুর্দিক।

নীরব কথন ইশকে ওলীর
যিকরে জলীর তুলবে সুর
সিক্ত জলে ভাসবে আবার
বালাই হাওর সমুদ্দুর।

০৩.
এতিম অনাথ দুস্থ জনের
বন্ধু ছিলেন যে-জন
মুর্শিদুনা ফুলতলী গো
ছিলেন যে এক রতন।

হারিয়ে তোমায় বুঝতে পেলাম
কী যে সোনার খনি
শোধ হবে না ঋণ গো তোমার
আমরা চিরঋণী।

প্রিয় ঠিকানা
এস এম মনোয়ার হোসেন

বালাই হাওর ডাকছে আমায় প্রিয় ঠিকানায়
যেখানে মুর্শিদ ঘুমিয়ে ফুলতলীর ওই গাঁয়
হে প্রিয় রাহনুমা তোমার বিয়োগে আজও
কাদে কতশত অসহায়
যেখানে মুর্শিদ ঘুমিয়ে ফুলতলীর ওই গাঁয়।

লাখো মুরিদের অশ্রু স্রোতে বালাই হাওর ভেসে যায়
সবি আছে আগের মতো মুর্শিদ নেই পাশে হায়
তোমার স্মৃতি আঁকড়ে ধরি নাযরে করমের আশায়
যেখানে মুর্শিদ ঘুমিয়ে ফুলতলীর ওই গাঁয়।

জীবনভরে শিক্ষা দিলে খোদার বাণী আল কুরআন
দেশ-বিদেশে গড়ে দিলে ইলমে হাদীসের বাগান
বহুমুখী খিদমতে স্মরণীয় হলে ধরায়
যেখানে মুর্শিদ ঘুমিয়ে ফুলতলীর ওই গাঁয়।

কিছু স্মৃতি যায় না ভোলা বারেবারে মন পোড়ায়
আমার এ পাথর হৃদয়ও বিয়োগ ব্যথায় জল ঝরায়
বছর শেষে বালাই হাওর একটু বুঝি প্রাণ জুড়ায়।
যেখানে মুর্শিদ ঘুমিয়ে ফুলতলীর ওই গাঁয়।

প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ
জামান আহমদ

জানুয়ারি ফিরে এলে কেঁদে ওঠে মন
কাকে যেন খুঁজে ফিরে ভাবে সারাক্ষণ
কান্নারা জমে বুকে বাঁধে যে পাথর
দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে বালাই হাওর।

হারানোর স্মৃতি ভাসে হৃদয় এলবামে
সুরে বেসুরে মর্সিয়া গাই মুর্শিদ নামে
সান্ত্বনা দেবে কে? নাই কারো মনোবল
ফুলতলী পানে ছুটে আশেকের দল
মুর্শিদ হারিয়ে আমি হয়ে গেছি যাযাবর
দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে বালাই হাওর।

শিখিয়ে গিয়েছ তুমি কালামের তিলাওয়াত
দেখিয়ে গিয়েছ তুমি নবী-সাহাবার পথ
মাদরাসা, মসজিদ গড়েছ এতিম নীড়
বেদ্বিনের কাছে কভু নত করোনি শির
সবুজ পাগড়ি মাথায় ছিলে কত মনোহর
দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে বালাই হাওর।

মাযার ঘিরে দেখি লাখোজনে কাঁদে হায়
যিয়ারতে হৃদয়েতে সান্ত্বনা যেনো পায়
পাইনি আমি বসার সুযোগ তব সহবতে
এসেছি এসেছি আজ প্রেমের মোলাকাতে
নাযরে কারাম চেয়ে দেহ কাঁপে থরথর
দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে বালাই হাওর।

আল্লাহর ওলী
এম এ ওয়াহিদ চৌধুরী

আল্লাহর ওলী ছাহেব কিবলাহ
গুণী হে মহান
দারুল কিরাতের প্রতিষ্ঠাতা
মুজাদ্দিদে যামান।

রঈছুল কুররা যুগ-যামানার
তিনিই মহান ওলী
যাঁর তুলনা আর কেহ নয়
লক্ষ জনের বুলি।

পনেরো জানুয়ারি বালাই হাওর
কাঁদছে মুরিদানে
প্রাণের প্রিয় ছাহেব কিবলাহ
নাই যে এ ময়দানে।

দোয়া করি লক্ষ হাতে
দরবারে মাওলার
দরজা তুমি বুলন্দ করো
হযরত ছাহেব কিবলার।

কাঁদে বিশ্ব ভূমি
ইয়াছমিন মাছুমা

যামানার মুজাদ্দিদ আল্লামা ফুলতলী
শতযুগ পেরিয়ে গেলেও ঘুচবে না
তোমার ঋণ হে প্রিয় ওলী

সদা মধুর তিলাওয়াতে
মুখরিত গুলজারে ফুলতলী
দিবানিশি চলছে শুনি
পাক কালামের সুরধ্বনি

কোটি মানুষকে করলে তুমি
হিদায়াতের পথ প্রদর্শন
দ্বীনী প্রসার ও মানবকল্যাণে
ছিলে উজ্জ্বল নিদর্শন

যুগে যুগে রবে তুমি
মোদের স্মৃতিতে অম্লান
তোমার শেখানো পথে থেকে
যায় যেনো মোদের প্রাণ

আজও নিরবে অশ্রু ঝরায়
কতো আশিক প্রেমি
আজও কাঁদে বিশ্ব ভূমি
হারিয়ে ওগো বাংলার রুমী

শিরতাজ খুঁজি
তানহা জনি

তুমি নাই তুমি নাই
মর্সিয়া গেয়ে যাই
বিষাদের সুর শুনি বাতাসে
কী করুণ হাহাকার
শোন কী গো রাহবার
তুমিহীন দিন শেষে রাত আসে।

খানেকা ও মাসজিদে
কাঁদে লাখো-লাখো হৃদে
হারালে কোথায় ওগো তুমি
হাওরের বুক জুড়ে
কত আশেকান ঘুরে
দেখা দাও বাংলার রূমী।

স্মৃতিগুলো বারবার
মন করে ছারখার
মাহফিলে শিরতাজ খুঁজি
খুশি যদি তুমি হও
তবে কেন দূরে রও
মুরশিদ, কেঁদে যাব রোজ-ই।

নিদ্রাহত মুসলিম
মো. আশিকুর রহমান

শীতের কুয়াশা হেরি
ওঠেছে রবি রাঙা প্রভাত
মুসলিম তুমি নিদ্রাহত
এখনো পোহায়নি রাত।

রিপুর তাড়নায় সমঝ তোমার
একেবারে পেয়েছে লোপ
তপোবনে তুমি ধ্যানে মগ্ন
মনে আবৃত লোভ।

সমাচ্ছন্ন ধন দৌলতে
তোমার বুদ্ধি বিবেক
সভয় তুমি শত্রু সামনে
মিছামিছি সব আবেগ।

জাগরণী গাহে কত নকিবে
মুযাযযিন দেয় আযান
শুনোনি তুমি খোদার আহবান
ঘুমের করেছো ভান।

শানে ফুলতলী
সাকিব মাহবুব

তোমার মতো গুণী খুঁজে
কাউকে পাই নি আমি
আমার কাছে ছিলে তুমি
সবার চেয়ে দামি
তুমি যে শামসুল উলামা
ওগো আল্লাহর ওলী।

ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে
সুন্দর মুখের ছবি
চেহারাটা ছিলো যেনো
নুরানি এক রবি।
তোমায় দেখে দেখে দিনটা
কেটে যেতো আমার
কী আকর্ষণ ছিলো তাতে
হয়নি সাধ্য বুঝার।
এতো দেখেও ইচ্ছে জাগতো
দেখি যেনো আবার।

বারে বারে মনে পড়ে
তোমার মুখের কথা
কেমন করে ভুলবো আমি
তোমার বিয়োগ ব্যথা।
তোমার কথা ভেবে ভেবে
দিবস করি পার
বিরহেরই জ্বালায় মনটা
কাঁদে যে বারবার।
ইচ্ছে জাগে নুরানি মুখ
দেখবো গো বারবার।

শীতকালে
মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর

রাত-দিবসে শীতল হাওয়া
কুয়াশা ভোর সন্ধ্যায়
লেপ টা ছেড়ে খুব সকালে
ওঠতে চায় না মন টায়।

গাছি ছোটে রস পাড়িতে
মজ্জিনের কাজ বাঁধা
বাগবাগিচায় ফুল ফোঁটে ভাই
শিউলি গোলাপ গাঁদা।

পথশিশু আর ছিন্নমূলের
কষ্ট খুবই শীতে
শীতের কাঁপড় কিনে দিয়ে
মনটা নেবো জিতে।

শিম কপি লাউ পালং মূলা
ফলে ক্ষেতে চালে
নানান পিঠা যায় পাওয়া যায়
ভরা শীতের কালে।

জান্নাতের দরজাসমূহ

জান্নাত মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে প্রার্থিত স্থান। সম্ভবত, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা হয় জান্নাত লাভের জন্য। জান্নাতের রয়েছে বিভিন্ন দরজা, মুমিনের আমল অনুযায়ী মুমিন সেই দরজাগুলো দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারাও বোঝা যায় যে, জান্নাতের বহু দরজা রয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো জান্নাতের দরজার আলোচনায় 'আবওয়াব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ দরজাসমূহ। রাসূল ﷺ-এর হাদীসের মাধ্যমেও বোঝা যায়, জান্নাতের কয়েকটি দরজা রয়েছে। তাঁর একটি হাদীসে তিনি এর সংখ্যাও বলে দিয়েছেন।

হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে আর বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল', তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। (সুনানে নাসাঈ, হাদীস-১৪৮)

এই আটটি দরজার নাম কোথাও একসঙ্গে পাওয়া না গেলেও কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় উক্ত দরজাগুলোর নাম পাওয়া যায়। আমরা সেই নামগুলো জানার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে নামায আদায়কারী, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান দরজা হতে ডাকা হবে। যে সাদকাহ প্রদানকারী, তাকে সাদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবূ বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, সকল দরজা হতে কাউকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৭)

উল্লিখিত হাদীসে চারটি দরজার নাম পাওয়া যায়।

১. বাবুস সালাত (নামাযের দরজা): যারা আন্তরিকভাবে নিয়মিত নামায আদায় করবে, তাদের সম্মানে জান্নাতের এই দরজার নাম করা হয়েছে বাবুস সালাত বা নামাযের দরজা।

২. বাবুল জিহাদ (আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের দরজা): যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর পথে তার জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করবে তাদের সম্মানে জান্নাতের এই দরজার নামকরণ হয়েছে বাবুল জিহাদ বা আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের দরজা।

৩. বাবুর রাইয়্যান (রোযাদারদের দরজা): যারা মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে রোযা রাখবে, তাদের সম্মানে এই দরজার নামকরণ করা হয়েছে বাবুর রাইয়্যান।

৪. বাবুস-সাদাকাহ (দানশীলদের দরজা): মানুষের প্রয়োজনে যারা তাদের অর্থসম্পদ দিয়ে মানুষকে সহযোগিতা করবে, তাদের সম্মানে এই দরজার নামকরণ হয়েছে বাবুস সাদাকাহ।

এছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে আরো যে দরজাগুলোর নাম পাওয়া যায় তা হলো—

৫. বাবুল আইমান, কেউ কেউ এই দরজাকে বাবুস শাফাআতও বলেছেন । কেউ আবার বাবুল মুতাওয়াক্কিলীনও (তাওয়াক্কুলকারীদের দরজা) বলেছেন। কিয়ামতের দিন যারা নবীজির সুপারিশে বিনা হিসাবে জান্নাতে স্থান পাবে, তাদের সম্মানে এই দরজার নামকরণ হয়েছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৬৮)

৬. বাবুল কাযিমিনাল গাইযা ওয়াল আ-ফিনা আনিন্না-স (রাগ দমনকারী ও লোকের ভুলকে ক্ষমাকারী ব্যক্তিদের দরজা): যারা লোকদের ভুলকে ক্ষমা করে এবং নিজের রাগকে দমন করে, এই দরজার নামকরণ তাদের সম্মানে। (উমদাতুল কারী-১৬/২৫৪)

৭. বাবুর রাদ্বিন (সন্তুষ্টদের দরজা): এই দরজাকে কেউ কেউ বাবুল যিকর, বাবুল হজ্জ, বাবুল ইলম ও বাবু লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-ও বলে। যারা আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও যাদের ওপর সন্তুষ্ট, তাদের সম্মানে এ দরজার নামকরণ হয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস-৩৫৮১)

৮. বাবুত তাওবা (ক্ষমা প্রার্থনার দরজা): নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাদের সম্মানার্থে জান্নাতের এই দরজার নামকরণ করা হয়েছে। এটি তাওবাকারীদের জন্য সবসময় খোলা থাকে। (জামিউস সগীর, হাদীস-৭৩২০)

আল্লাহ তাআলা আমাদের জান্নাত নসীব করুন। জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য আমল করার তাওফীক দিন।

গ্রন্থনাঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

১৩১. ضَرِيْبَةٌ (দারিবাতুন): বাংলারূপ **জরিপ**। পরিমাপ, Survey.

১৩২. ضِلْعٌ (দিলউন): বাংলারূপ **জিলা/জেলা**। পাঁজর, পাঁজরের হাড়, প্রশাসনিক বিভাগ, District.

১৩৩. طُوْفَانٌ (তুফানুন): বাংলারূপ **তুফান**। ঘুর্ণিঝড়, Storm.

১৩৪. طَلَبٌ (তালাবুন): বাংলারূপ **তলব**। চাওয়া, জিজ্ঞাসাবাদ, খোঁজ করা, Ask. যেমন- প্রধানমন্ত্রী তলব করেছেন।

১৩৫. طَاقَةٌ (তাকাতুন): বাংলারূপ **তাকত**। শক্তি, সামর্থ্য, সাহস, Power.

১৩৬. طَبْلَةٌ (তাবলাতুন): বাংলারূপ **তবলা**। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, Tomtom.

আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে।

১৩৭. طَنْبُوْرٌ (তানবুরুন): বাংলারূপ **তানপুরা**। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, Tomtom.

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান



আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

২০২৫ সাল কিন্তু আমাদের দোড় গোড়ায়। জানুয়ারিতে আমরা নতুন ক্লাসে পাড়ি দিচ্ছি। দুআ করবে; নতুন ক্লাসের নতুন বই যেনো সহজে পড়তে পারি, আর প্রতিমাসে পরওয়ানা যেনো হাতে পাই, সেই প্রত্যাশা রাখছি।

বুশরা বিনতে নাসির
করৈয়া বাজার, ছাগলনাইয়া, ফেনী

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

-আন্দালিব ভাই

হুম, তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। নতুন ক্লাসের নতুন বই সত্যি মনে অন্যরকম আনন্দ দেয়। হ্যাঁ, তোমার খুশি আরও বাড়িয়ে দিতে কিন্তু তোমার প্রিয় পত্রিকা পরওয়ানা আছে তোমার সাথে সবসময়। নতুন ক্লাসে পরওয়ানার পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম। নতুন বই পড়ে কেমন লাগলো তা জানাবে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

পরওয়ানা হাতে পেয়ে খুব খুশি হলাম। মনোরম প্রচ্ছদে পরওয়ানা ডিসেম্বর সংখ্যা মন কেড়েছে। অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি পরওয়ানার মাধ্যমে। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ।

মারিয়া আক্তার
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

তোমার খুশিতে আমরাও খুশি। পরওয়ানা পরিবারের পক্ষ থেকে তোমাকেও শুভেচ্ছা। পরওয়ানার মাধ্যমে অজানাকে জানতে পেরেছো শুনে আমরাও খুশি হলাম। তুমিও লিখবে পরওয়ানায়।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

আবাবীল ফৌজ মাসিক পরওয়ানার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যা আমাদের মতো ছোটদের অনেক আনন্দ দেয়। আমি সবসময় যত্ন সহকারে আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো পড়ি। আমাদের জন্য সবসময় এরকম ভালো কিছু উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা করি।

নাহিদ কাউসার
কেন্দুয়া, নেত্রকোণা

-আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার আবাবীল ফৌজ তোমাদেরই বিভাগ। তোমাদেরকে আনন্দ দিতে পারায় আমরাও খুশি। পরওয়ানার সাথেই থাকবে, সবসময় নতুন নতুন কিছু পাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

আমি পরওয়ানার গ্রাহক হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পরওয়ানার মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় জানতে পারছি। পরওয়ানা হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের এক সমাবেশ। যেখান থেকে নতুন অনেক বিষয় শিখতে পারছি। বিশেষ করে, জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগেও নিত্য নতুন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করে সুন্দর সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য পরওয়ানা পরিবারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সানজিদা আফরিন
গাবতলী, বগুড়া

-আন্দালিব ভাই

তোমার অভিব্যক্তির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পরওয়ানার মাধ্যমে তোমার জ্ঞানরাজ্যের সমৃদ্ধি হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। আশা করি পরওয়ানার সঙ্গেই থাকবে।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

প্রিয় বন্ধুরা!

আশা করি সবাই বেশ ভালোই আছো। আর ভালো থাকারইতো কথা। কারণ সবেমাত্র তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফল পেয়ে নতুন ক্লাসে পদার্পণ করেছো। তোমাদের ভালো ফলাফলের জন্য যে এতো দুআ করলাম তোমরা কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়াই জানাওনি। তোমাদের পরীক্ষার ফলাফল কিন্তু জানানোর কথা ছিল।

ওহ, মিষ্টি খাওয়াতে হবে বলে ভয় পাচ্ছো? না, কোনো ভয় নেই, মিষ্টি খাওয়ানোর ঝামেলাতে যাওয়ার দরকার নেই। শুধুমাত্র তোমার ফলাফলটিই আমাদের খুশির বিষয়। তোমরা নতুন ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছো। কেউবা আবার নতুন ক্যাম্পাসে পদার্পণ করেছো। তোমাদের নতুন ক্লাস, নতুন বই, নতুন ক্যাম্পাস কেমন লাগলো তা কিন্তু আমাদের লিখে পাঠাতে পারো। নতুন ক্লাসে নতুন কোনো বন্ধু পেলে তার কাছে পরওয়ানা পৌঁছে দিবে। পরওয়ানা নিয়ে তার অনুভূতিও চিঠি লিখে আমাদের জানাতে পারো।

বন্ধুরা!

২০২৫ সালের আগমনের সাথে সাথে ঘটেছে শীতেরও আগমন। শীতের আমেজ নতুন নতুন পিঠাপুলিরও দেখা মিলে। আজকাল যদিও সেই আগের দিনের পিঠাপুলির দেখা কম মিলে, কিন্তু গ্রাম-গঞ্জে এখনও পিঠা খাওয়ার প্রচলন রয়ে গেছে। শীতের সকালে পিঠা খেতে খেতে মক্তবে যাওয়ার স্মৃতি এখনও মানসপটে ভেসে ওঠে। তোমরা কে কী পিঠা খেতে পছন্দ করো। তোমার জানা পিঠার নামও আমাদের লিখতে পারো।

আবাবীল বন্ধুরা!

তোমরা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব (র.) এর নাম শুনেছো। কেউ কেউ দেখেছোও হয়তো। যার পুরো নাম মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী। জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ তার ঈসালে সাওয়াব মাহফিল। ২০০৮ সালের এই দিনে তিনি মাওলায়ে হাকীকীর দরবারে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সময়ের সবচেয়ে বেশি মানুষের উপস্থিতিতে তারই আবাসভূমি বালাই হাওরে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে বিদায় দিয়েছিলেন লাখো হৃদয়। তারই স্মৃতি বিজড়িত এই বালাই হাওরেই অনুষ্ঠিত হয় মুবারক এই মাহফিল। যেখানে আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেবজাদা ফুলতলী তালীম ও তারবিয়াত প্রদান করেন। আমরা ফুলতলী ছাহেবের আদর্শিক সৈনিক। তার রূহানী ফাইয যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন। তার দারাজাতকে যেন আল্লাহ বুলন্দ করেন। সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো। শীতে শরীরের যত্ন নিও। এই প্রত্যাশায় বিদায় নিলাম।

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আমন্ত্রণে ছাহেব কিবলাহ (র.) এর সভাপতিত্বে বাইতুল মুকাররামে অনুষ্ঠিত পীর-মাশায়িখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?

২. বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়?

৩. আনফাসুল আরিফীন কিতাবের লেখক কে?

৪. এর পূর্ণরূপ কী?

৫. শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) কত হিজরীতে ইন্তিকাল করেন?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ৩৫ হিজরীতে

২. ইমাম বাইহাকী (র.)

৩. ৫ নভেম্বর

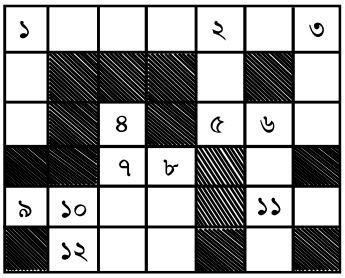
৪. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র.)

৫. ২০২২ সালে

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

মো: রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন দাখিল মাদরাসা, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # শাহ সাদমান সামি,হযরত শাহ জালাল লতিফিয়া আইডিয়াল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # জাহেদা আক্তার (শবনম), নিজ ঢাকাদক্ষিণ, মুন্সিপাড়া, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মো. হারুনুর রশীদ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রাহীন আহমদ সালেহ, দক্ষিণ রাইগদাড়া, ওসমানীনগর, সিলেট # মারজান আল লতিফ, সীমান্তিক ইন্টারনেশনাল হাইস্কুল, ইছামতি, জকিগঞ্জ, সিলেট # সাব্বির আহমদ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # হাফিয মো. আশরাফুল ইসলাম, দক্ষিণভাগ, ভাটেরা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # তানজিনা রহমান ইমরা, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাসলিমা আক্তার, আল আমিন নার্সিং কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আব্দুল্লাহ আল মুসাদ্দিক, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # নূর আহমদ রাহাত, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

শব্দকল্প



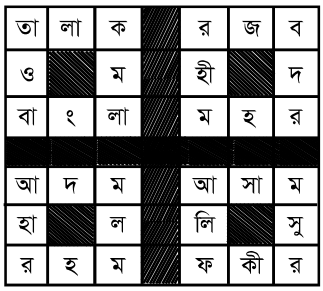
সূত্র : পাশাপাশি

১। ইন্তিকাল পরবর্তী মুমিন ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতে সাওয়াব পাঠানো ৫। কিতাবপ্রাপ্ত পয়গম্বর ৭। প্রতিপালক এর আরবী ৯। ঈদের নামাযের স্থান ১১। ধাতুনির্মিত সরু সুতো ১২। নগর।

সূত্র : উপর-নীচ

১। বিশ্বাস ২। হজ্জের নির্দিষ্ট সময় ব্যতিত বাইতুল্লাহ যিয়ারত করা ৩। বলবৎ, বজায় ৪। মাযার ৬। মুসলিম রাজা বা বাদশাহ ৮। জলযান বা স্থলযানের সম্ভার ১০। দশক।

গত সংখ্যার সমাধান



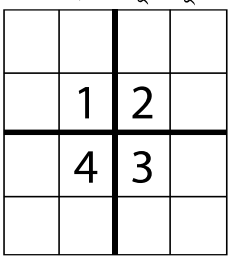
গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী
মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম
সুপার, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদ্রাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # শাহ সাদমান সামি, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া আইডিয়াল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # ছদরুল আমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক,বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখা # মাহবুবুর রহমান, সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সিলেট সেনানিবাস, সিলেট # বুশরাত জাহান, শ্রীমঙ্গল আনোয়ারুল উলুম ফাদ্বিল ডিগ্রী মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # আব্দুস সামাদ, গ্রাম:বাদে ভূকশিমইল, ডাক:ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. তামবীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী-৩২৫১, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মাহমুদুল হাসান মারুফ, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া,জাহান আরা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়,লক্ষিপাশা, চরমহল্লা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # কামরুল ইসলাম, সঈদপুর বাজার ফাজিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # হুসাইন আহমদ, ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষ, রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাদিল ডিগ্রি মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

সুডোকু

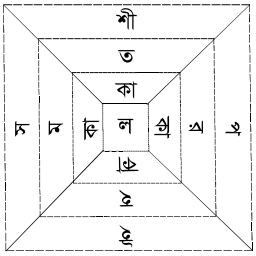
এ সংখ্যার সুডোকু



সমাধানের নিয়ম

এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ২×২ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবার থাকে।

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের সমাধান



গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী
আজিম উদ্দিন মাছুম
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

কামরুল ইসলাম,সঈদপুর বাজার ফাজিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # হুসাইন আহমদ, রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাদিল ডিগ্রি মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # শাহ সাদমান সামি, হযরত শাহ জালাল লতিফিয়া আইডিয়াল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # ছদরুল আমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখা # তাওহিদুর রহমান চৌধুরী, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # খাইরুল ইসলাম সাদী, আল্লামা আব্দুল মুকিত মঞ্জলালী একাডেমি, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মাহবুবুর রহমান যাকী, ভাদেশ্বর মডেল ফাযিল মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মারজানা রহমান হুমায়রা, সবুজকুঁড়ি শিশু বিদ্যালয়, ইলাইগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # আব্দুস সামাদ, বাদে ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আবু সালেহ রিয়াদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মুহাইমিন চৌধুরী তালহা, ক্যাপ্টেন একাডেমি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।

অদ্ভুত পৃথিবী

আমাজন জঙ্গলের রহস্য

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রেইনফরেস্ট হলো আমাজন জঙ্গল। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকায় এটি অবস্থিত। আমাজন জঙ্গলটি আদিবাসীদের প্রায় আদিম জীবন এবং লক্ষ লক্ষ জন্তু ও প্রাণীকূলের এক অন্য জগত। স্প্যানিশ পর্যটক ফ্রান্সিসকো ডি ওরেলানা প্রথম মানুষ যিনি আমাজন নদী ধরে পৌঁছে যান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই রেইনফরেস্টে। মূলত ধন-রত্নের খোঁজে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষেরা আমাজনে যাত্রার পরিকল্পনা করতো। কারণ পর্তুগিজরা বিশ্বাস করতো, এ জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে এলডোরাডো নামক এক গুপ্ত শহর যা পুরোপুরি সোনার তৈরি। একটি গ্রীক পৌরাণিক গল্প থেকে তাদের এই ভ্রান্ত ধারনাটি তৈরি হয়েছিল। এরপর থেকে বিশেষ করে পর্তুগিজ, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ অধিবাসীরা প্রতিযোগীতায় নামে এই এলডোরাডো শহর আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এই কাল্পনিক শহরের খোঁজ পায়নি। আমাজন সবচেয়ে বড় নিরক্ষীয় বন, যা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তরভাগে অবস্থিত ৯টি দেশের অন্তর্ভুক্ত,যার ৬০% রয়েছে ব্রাজিলে, ১৩% রয়েছে পেরুতে এবং বাকি অংশ রয়েছে কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, দক্ষিণ গায়ানা, সুরিনাম এবং ফরাসি গায়ানা জুড়ে। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মোট আয়তনের ৪০% এই আমাজন জঙ্গলের দখলে। পৃথিবী জুড়ে যে রেইনফরেস্ট বা ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল রয়েছে তার অর্ধেকটাই এই আমাজন নিজেই। আমাজন জঙ্গলে প্রায় ১৬০০০ প্রজাতির ৩৯০ বিলিয়ন বৃক্ষ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৪০ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ, ২.৫ মিলিয়ন প্রজাতির কীট-পতঙ্গ ১,২৯৪ প্রজাতির পাখি, ৩৭৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪২৮ প্রজাতির উভচর এবং ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ হাজারো প্রজাতির অজানা জীব-অণুজীব। আমাজনকে রেইনফরেস্ট বলা হলেও এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, এখানে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় বরং রেইনফরেস্ট বলা হয় এখানকার অত্যধিক আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত (বর্ষা মৌসুমে) এবং গরম আবহাওয়ার কারণে। প্রচণ্ড গরমের কারণে এখানে বাষ্পীভবনের হার অনেক বেশি যা আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ। এসব আবহাওয়ার কারণে সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের বৈচিত্র্যময় সমাহার দেখা যায়। বিভিন্ন জীবের পাশাপশি কিছু ক্ষতিকর প্রাণীও আছে আমাজন জঙ্গলে। তাদের মধ্যে জাগুয়ার, অ্যানাকোন্ডা পিরানহা, রক্তচোষা বাদুর, বিষাক্ত ব্যাঙ, বৈদ্যুতিক মাছ, রেবিস, ম্যালেরিয়া, ইয়েলো ফিভার, ডেঙ্গু ফিভারের জীবানু অন্যতম। তবে জীবজন্তু আর উদ্ভিদের এই স্বর্গরাজ্যে প্রায় ৩৫০টি ভিন্ন উপজাতির প্রায় ৩ কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করে। তারা বেশির ভাগ ব্রাজিলীয়। পর্তুগিজ, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ ভাষাও কথা বললেও এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু আছে যাযাবর। এমনকি হাজার বছর ধরে আদি ইনডিয়ানরা এখানে বসবাস করে আসছে। বহিঃবিশ্বের সাথে এদের তেমন যোগাযোগ নেই।

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৫০২. মুহসিন বিল্লাহ সাদী
পিতা: মোহাম্মদ জাহির উদ্দিন
গ্রাম: সাতপাড়া
ডাক: সোনালী বাংলাবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৫০৩. নূসরাত জাহান জাকিয়া
পিতা: আপ্তাব উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নূতনবাজার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: কাকুরা
ডাক: জাতুয়া
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫০৪. ফাহমিদা তালুকদার
পিতা: নূর মোহাম্মদ তালুকদার
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: ভূরকীবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৫০৫. তোফায়েল মিয়া
পিতা: তখলিছ মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বিশ্বনাথ ডিগ্রি কলেজ
গ্রাম: পুরান সিরাজপুর
ডাক: বিশ্বনাথ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৫০৬. মোছা: আলফিনা আক্তার সুরভী
পিতা: মরহুম ইদ্রিস মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নরসিংপুর আদর্শ হাফিযিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: নরসিংপুর
ডাক: নরসিংপুর বাজার
থানা: দোয়ারাবাজার
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫০৭. তানজিনা আক্তার শুভা
পিতা: মরহুম মাহমুদ আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নরসিংপুর আদর্শ হাফিযিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: খাইরগাঁও
ডাক: নরসিংপুর
থানা: দোয়ারাবাজার
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫০৮. মামুন আলী মাহদী
পিতা: মাওলানা শাহনূর আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: আইডিয়াল ইসলামিক কেজি স্কুল
গ্রাম: লক্ষ্মিপাশা
ডাক: চরমহল্লা
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫০৯. মো. শুয়াইবুর রহমান
পিতা: লুৎফুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: আউশকান্দি ইয়াকুবিয়া হাফিযিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: দেওতৈল
ডাক: একে হিরাগঞ্জ
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

৩৫১০. আহমদ মুনাইম জামী
পিতা: মাওলানা আব্দুল বাসিত
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নতুনবাজার দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: ধারণ
ডাক: ধারণবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫১১. সামিউল ইসলাম ইফতি
পিতা: নূরুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মৈশাষী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: তিলকচানপুর
ডাক: ধারণবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ



প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্সুস (হাদীস ও ফিক্হ)

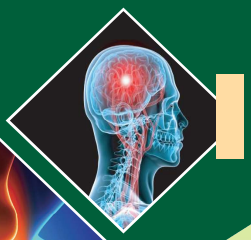
مركز الفولتلى داكا

FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে









- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগন্জ

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

আপনি কি ২০২৬, ২০২৬, ২০২৬ সালের মধ্যে

হজ্জ করতে চান?

মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন

ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী

আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী

+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা

Khaja Air Liner

খাজা Khaja air Liner

Travel & Tours

হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড ট্যুরস

Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

TURKISH AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

Emirates

QATAR AIRWAYS

SINGAPORE AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

REGENT

NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস

সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার

01724 926 329, 01714 486796

www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস

হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল

01724 691 177, 0248 313524

khajaairliner@yahoo.com

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর

LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR

(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)

বৈশিষ্ঠাবলী

- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
- কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- প্রবাসী ও দুরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
- ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
- বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
- একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
- পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ



সফলতার ১ যুগ

ভর্তি চলছে

প্রতিবছর

১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু

২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা

নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন

১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু

বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা

যোগাযোগ

মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল

মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮

E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

ক্যাম্পাস | দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট

LATIFI HANDS

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

EDUCATION
ORPHANS
HOUSING PROJECTS
MASJID PROJECTS
INFRASTRUCTURE
SUSTAINABLE LIVELIHOODS
AGRICULTURE SUPPORT
WEEDING SUPPORT
SADAQAH PROJECT

HEALTH CARE
EYE CARE
GIFT
QURBANI PROJECT
EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
BLIND AND DISABLED PROJECT
WATER PROJECT
WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাসে

দাখিল নবম শ্রেণিতে

ভর্তি চলছে

সীমিত আসন

আমরা ভিন্ন কেন?

- আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।
- ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

যোগাযোগ

01700-842680, 01772-959072
01712-904501, 01737-769053

হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

লতিফ ট্রাভেলস

লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TOAB TDAB

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬৩ লতিফ ট্রাভেলস

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

হজ্জ & ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী **আমাদের** যেকোন **শাখায় রেজিস্ট্রেশনের** আজই যোগাযোগ করুন -

- এয়ার টিকেট
- প্যাকেজ ট্যুর
- ম্যানপাওয়ার
- ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড। ভার্থখলা। সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

তৈরি পোশাকে
একধাপ এগিয়ে

লতিফিয়া টেইলার্স

এন্ড এম্ব্রয়ডারী

লেডিস এন্ড জেন্টস

এখানে জুব্বা,
পায়জামা এবং পাঞ্জাবী
আধুনিক ও মানসম্পন্ন
এম্ব্রয়ডারি ডিজাইনে
দক্ষ কারিগর
দ্বারা তৈরি করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য
মাদরাসা ও স্কুল ড্রেস
তৈরি করা হয়

মাওলানা মো. নাজমুল হুদা
মোহাম্মদ যুহায়ের আহমদ
০১৭৮৫-০৫৩৬০৬
০১৫৭৬-৫০৭৩৮৮

দোকান নং-৪, সোবহানীঘাট কামিল মাদরাসা মার্কেট, সোবহানীঘাট, সিলেট

রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, সুলতানুল আরিফীন

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর

১৭তম বার্ষিক

ঈসালে সাওয়াব মাহফিল

২০২৫

১৫ জানুয়ারি, বুধবার

সকাল ১০টা থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত

ফুলতলী ছাহেব বাড়ি সংলগ্ন

বালাই হাওর জকিগঞ্জ, সিলেট

তা'লীম-তরবিয়ত প্রদান করবেন

হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী

বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর
মুরিদীন মুহিব্বীনসহ সবাই আমন্ত্রিত।

ঈসালে সাওয়াব মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটি

ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, জকিগঞ্জ, সিলেট

Al ISLAH
CASH & CARRY



CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127